আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার পঞ্চচত্বারিংশ গ্রন্থ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আষাঢ়—১৩২৭।

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।
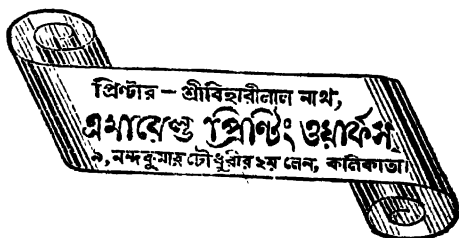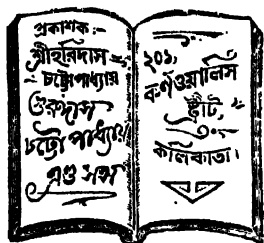
শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

উৎসর্গ

যিনি স্বীয় অসামান্য প্রতিভাপ্রভাবে প্রাচ্যপ্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এবং যাবজ্জীবন অধ্যবসায় সহকারে সেই জ্ঞানানুশীলনে কালাতিপাত করিয়া দেশমান্য ও বিদ্বদ্বরেণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, যিনি পুত্র-নির্ব্বিশেষে শত-সহস্র শিক্ষার্থীদিগকে সস্নেহে জ্ঞানশিক্ষা দান করিয়া সকলের পরম ভক্তির আস্পদ হইয়াছেন; যিনি ভবিষ্যদ্ বিদ্যার্থিগণের সৎশিক্ষার নিমিত্ত ইংরাজি বাঙ্গালা শব্দকোষাদি বিবিধ বহুমূল্য গ্রন্থরত্নাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই আশ্রিতবৎসল কর্ম্মবীরাগ্রগণ্য পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয়

বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলোদ্দেশে আমার আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

আহারবেলমা, বর্দ্ধমান
১লা শ্রাবণ, ১৩২৭।

প্রণত
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

দেওয়ানজী

১

সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণপুরের জমীদার। এক সময় শিরোরোগের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনের বিশেষ আবশ্যক হওয়ায়, তিনি সপরিবারে তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেন। সঙ্গে একমাত্র কন্যা মায়াদেবী ও পত্নী সরলা দেবী। একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমীদারের বিদেশ যাত্রা করিতে হইলে, যত প্রকারের লোকজন সঙ্গে থাকা উচিত সে সবই তাঁহার সঙ্গে ছিল। ৺বৈদ্যনাথধাম হইতে আরম্ভ করিয়া গয়া, কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, পুষ্কর, আজমীর, পরে কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বৈশাখের শেষে রোগোপশমে মনের তৃপ্তিতে দেশে ফিরিবার ইচ্ছা করেন।

সেই সময় হঠাৎ একদিন সরলা দেবীর হৃদ্‌রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। হৃষীকেশে চিকিৎসার কোনও সুবিধা না থাকায় রেল কোম্পানীকে প্রচুর অর্থ দিয়া একখানি গাড়ী রিজার্ভ করিয়া তিনি ৺কাশীধামে যাত্রা করেন; কিন্তু সরলা দেবীর রোগের মাত্রা বৃদ্ধি হওয়ায় লক্ষ্ণৌএ নামিতে বাধ্য হন।

দৈব-বিড়ম্বনায় সদাশিববাবু লক্ষ্ণৌ আসার আট দশ দিন পরেই সেখানে প্লেগের সূচনা হয়। পত্নীকে স্থানান্তরিত করিবার মত অবস্থা না থাকায়, মহামারী প্লেগের অতি ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি

দেখিতে-দেখিতে, সদাশিববাবু একদিন নি[illegible] দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—শেষ শয্যায় [illegible] অন্তিমযাত্রী পত্নী সরলা দেবী অভ্রান্ত নিয়তির কঠোর আদেশে আসন্ন মৃত্যুর কবলে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন ; তথাপি চির-আদরের সংসার, দেবোপম স্বামীর অগাধ ভালবাসা, আর স্নেহাধার একমাত্র শুশ্রূষারতা কন্যা মায়াদেবীর অফুরন্ত মায়াকে ছাড়িবার ইচ্ছা আদৌ নাই, অথচ শত ইচ্ছা সত্ত্বেও থাকিবার কোন শক্তি নাই,—ইহ-পরজীবনের এমনই সন্ধিক্ষণে করুণা-কাতর দৃষ্টিতে তাঁর চির-আরাধ্য স্বামীর পাদস্পর্শ করিয়া মায়াকে সৎপাত্রে দান করিবার জন্য শত অনুরোধে আবদ্ধ করিতেছেন।

প্রকৃতির চিরন্তন প্রথাতে সৃষ্টির মধ্যে মৃত্যুই চির স্থির,—সত্য—ধ্রুব। জীবমাত্রেই একদিন, সে সত্যের পাশে আবদ্ধ হইতে—সেই সত্যের হাতে জ্ঞানে-অজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিতেই বাধ্য। এ বাধ্যতার মূলেও জীবের কামনা বাসনার অন্ত নাই। হিন্দু সতী মাত্রেই অন্তিম বাসনায় প্রার্থনা করেন—যেন স্বামি-পুত্রের হাসিমুখ দেখিয়া ইহজীবনের শেষ করিতে পারেন। যে সতীর ভাগ্যে তাহা ঘটে—যে সতী সে পথের শরণ লইবার জন্য প্রস্তুত হন, তিনিই ভাগ্যবতী, তিনিই পুণ্যবতী, তাঁর স্মৃতি, তাঁর কর্ম মানবের স্মরণীয়। সে স্মরণীয় দিনের পুণ্যস্মৃতিতেই বিভোর হইয়া এ তীর্থ-যাত্রায় অতিরিক্ত ধনপ্রাণ ব্যয়ের পর অবশিষ্ট এক মাত্র মাতৃহারা কন্যা মায়া ও বৃদ্ধ দেওয়ান সনাতন রায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সদাশিববাবু ৺কাশীধামে আসিয়া বিশ্বনাথের আশ্রয়ে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রথম শোকের তীব্র জ্বালায় একবারও মনে করেন নাই যে, বিপত্নীক হইয়াও

আবার তাঁহাকে দেশে আসিয়া দশের মতই জীবন-যাপন করিতে হইবে। তাঁর নিজের মন 'কৌপীনবন্ত' হইতে চাহিলেও, মায়ার মায়ায়, দেওয়ানজীর অনুরোধে এবং নারায়ণপুরের প্রজাদিগের কাতর আহ্বানে সে-সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অগত্যা দেশে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

২

সদাশিববাবুর গাড়ী ৺কাশীধাম ত্যাগ করিয়া মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। যে গাড়ীতে তাঁহাদের যাত্রা করিবার কথা ছিল, সেই গাড়ীখানি নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে আসিবে, জানিতে পারিয়া সদাশিববাবু কন্যার হাত ধরিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমে এদিক-ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। প্ল্যাট্‌ফরমের একপার্শ্বে একটি অনিন্দ্য-সুন্দর বিংশবর্ষীয় যুবক মহাগুরু-নিপাতের সমস্ত চিহ্ন ধারণ করিয়া, অতি ম্রিয়মাণ অবস্থায়, যেন ট্রেণের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মায়া তাহার দিকে চাহিয়া সদাশিববাবুকে বলিল, "দেখ বাবা, এঁকে যেন আমাদের দেশের লোক, দেখা লোক ব'লে মনে হচ্চে না? জিজ্ঞাসা করুন ওঁর বাড়ী কোথায়? কে মরেছে? কোথায় যাবেন?" আরও কত কি হয় ত সে তাহার বালিকা বয়সের চাপল্যেই হউক অথবা অন্য কোন অজানা আকর্ষণেই হউক, পিতাকে শিখাইয়া দিত; কিন্তু সদাশিববাবু যুবকের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"এ যে আমাদের প্রণবকৃষ্ণ! জ্ঞানানন্দের ছেলে।"

সদাশিববাবুর কথা শেষ না হইতেই প্রণবকৃষ্ণ তাঁহার

পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং কথায় কথায় তাঁহাদের আকস্মিক পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া সকরুণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার দাদা-মহাশয় তাঁর অসুখের সংবাদ দিয়া আমাদের সকলকেই দেখিতে চাহিয়া 'তার' করেন। বিশেষ কার্য্যের জন্য বাবা মহলে বাহির হইয়াছিলেন, কোথায় আছেন জানা না থাকায় আমিই মাকে সঙ্গে লইয়া সাতদিন হইল ৺কাশীধামে আসিয়াছিলাম। আমাদের আসার পর দুইদিন মাত্র দাদা-মহাশয় জীবিত ছিলেন। তার পর তাঁর ৺কাশীলাভ হয়। দাদা-মহাশয়ের মৃত্যুর দিন হইতেই মায়ের শরীর খুবই খারাপ হয়। কোনও প্রকারে দাদা-মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-কার্য্যাদি সমাধা করিলেন। পঞ্চম দিনেই মায়ের অবস্থা হঠাৎ এমন হইয়া উঠিল যে, কোন ডাক্তারই তাঁর রোগ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। ইতোমধ্যে বাবা আসিয়াছিলেন। তাঁর আসার পর মায়ের শেষ জ্ঞান ফিরিয়া আসে। গত কল্য বেলা দশটার সময় তাঁর ৺কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। বাবা দু'এক দিন পরেই আসিবেন, পথশ্রমে তাঁর শরীর বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে। শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে ও পিসীমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমি অদ্যই যাইতেছি। মায়ার আমার সমান দশা হইল।" তার পর মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল,—"মায়া, ছেলেদের চোখের জল মায়েরা যেন কখন দেখ্তে না পান, আমাদের চোখের জলে তাঁদের মন স্বর্গেও আনন্দে থাক্‌তে পার্‌বে না। তাই তোমায় চোখের জল ফেল্‌তে নিষেধ কচ্ছি। মা আমার সব শেষে ব'লে গেলেন,—'আজ হ'তে প্রত্যেক নারীর মধ্যে আমায় দেখ্‌তে চেষ্টা ক'রো বাবা! আজ আমার এক শরীর বহুত্বে ব্যাপ্ত হ'যে; দুঃখ ক'রো

না, বাবা!' মায়ের কথা আমার মনের মধ্যে যেন প্রতিনিয়ত আমাকে একটা উত্তেজনায় ফেলে—কেবল মায়ের সেই হাসিমুখ মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। আর আমার চোখ দুটো যেন আপনা হ'তেই জলে ভেসে আস্‌ছে। মনে হচ্ছে একবার কাঁদ্‌তে পারলে যেন মনের সমস্ত চাপা বোঝাটা জল হ'য়ে নেমে যায়, কিন্তু মায়ের আদেশে,—অনুরোধে তাঁর অতৃপ্তির ভয়ে তা পাচ্ছি না, তাই যেন সব কথাগুলো বুঝিয়ে বল্‌তেও পারছি না। সব যেন তাল বেঁধে একসঙ্গে মুখের উপর উঠে আস্‌ছে।"

এমন সময় রেলগাড়ী বিপুল জনসঙ্ঘ দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া তাহার বিশাল শরীরের মধ্যে যাত্রীদের প্রবেশ করাইয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। 'বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ' যাত্রিদল স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়াই শশব্যস্তে তাহার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে সদাশিববাবু যাইবার সময় যেরূপভাবে গিয়াছিলেন, এবারে প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকৃত হইয়াও, শত চেষ্টা করিয়াও রেল কোম্পানীর সে অনুগ্রহ না পাওয়াতে সাধারণ ভাবেই সাধারণ গাড়ীতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সদাশিববাবু প্রণবকেও তাঁহাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিতেছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধা আসিয়া প্রণবের বলিষ্ঠ দেহের দিকে চাহিয়াই অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিল,—"বাবা, আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে দাও বাবা—আমার কেউ নেই বাবা, তোমার ভাল হবে বাবা, যাদের সঙ্গে এসেছি বাবা, তাদের খুঁজে পাচ্ছি না বাবা, দোহাই বাবা, তুলে দাও বাবা।" বলিতে-বলিতে কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে সদাশিববাবু মায়াকে লইয়া

বসিতে গেলেন। প্রণবকেও সেই নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে বসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে যথাস্থানে বসিতে বলিয়া, তাঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন। এদিকে বৃদ্ধাকে লইয়া প্রণবকৃষ্ণ যথাসাধ্য চেষ্টায় কোনও রূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, নিজের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটখানি তাহাকে দিয়া সদাশিববাবুর গাড়ীতে তাহাকে উঠাইয়া দিল। বৃদ্ধার টিকিটখানি নিজে লইয়া পরিবর্ত্তনের জন্য টিকিট ঘরের দিকে আসিবে, এমন সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিবার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বিপুল জনতায় স্থান না পাওয়াতে মধ্যম শ্রেণীর টিকিট থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ দেওয়ানজী চাকরদের জন্য নির্দ্দিষ্ট একখানা নির্জ্জন গাড়ীতে বসিয়াছিলেন। প্রণবকৃষ্ণ সেইখানেই উঠিতে বাধ্য হইল। বৃদ্ধ দেওয়ান সনাতন রায় মহাশয় সেকালের লোক, প্রণবকে তিনি অনেকদিন দেখিয়াছেন, তাই সম্ভ্রমের সহিত তাহাকে নিজের স্থানে বসিতে দিয়া তাহার পার্শ্বেই তিনি বসিলেন। প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, —"দেখুন প্রণববাবু, আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি। আপনার তা মনে না থাক্‌তে পারে। তা যাক্, এখন এই পাশের গাড়ীতে দুটী বাঙ্গালীর মেয়ে বসে আছে, গাড়ী চলা সুরু হ'তেই একটা মাতাল গোরা সাহেব জানালা দিয়ে তা'তে উঠেছে! আমার কেমন মনে হচ্চে। একটু নজর ক'রে দেখুন দেখি, ব্যাপারটা কতদূর কি হ'য়ে দাঁড়ায়। মেয়ে দুটি ভদ্রঘরের ব'লেই মনে হয়। সঙ্গে পুরুষ আছে ব'লে ত মনে হ'ল না। যাতে তা'দের ওপর কোন অন্যায় না হয় তার প্রতি লক্ষ্য করতে চেষ্টা করুন।"

দেওয়ানজীর কথায় প্রণবকৃষ্ণ অস্থির হইয়া জানালার উপর ভর দিয়া কি দেখিল, সেই জানে! তারপর জানালার ফাঁক দিয়া

চলন্ত ডাকগাড়ীর বাহিরে পা-দানির উপর দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে প্রাণপণ চেষ্টায় বায়ুর তীব্রবেগে পুনঃ পুনঃ নিজে ধাক্কা খাইতে খাইতে জানালার পর জানালা পার হইয়া পাশের যে গাড়ীতে ভদ্রমহিলাদ্বয় ছিলেন, সেই গাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। দেওয়ানজীর বার্দ্ধক্য-সুলভ ক্ষীণ দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, বায়ুর তীব্রগতি ও ধূলারাশি তাঁহাকে ততই দৃষ্টিহারা করিয়া দিতে লাগিল। শেষে সেই অশীতিপর বৃদ্ধ সেই বিপদের মধ্যে একটি তরুণ যুবককে ফেলিয়া দিয়া, অতি অনুতপ্তের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, করুণ কণ্ঠে প্রাণের আবেগে বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনের নিকট তার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

৩

গাড়ী পরের ষ্টেশনে আসিতেই দেওয়ানজী অতি ব্যস্ততার সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া সদাশিববাবুর নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"চলন্ত গাড়ীতে সাত-আনীর বাবুর ছেলে বেরিয়ে অপর গাড়ীতে গেছেন।" সে গাড়ীতে যে ব্যাপারের কথা তিনি প্রণবকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, এবারও তাহা তাঁহার প্রভুর নিকট বলিতে অন্যথা করিলেন না। তার পর বলিলেন,—"একবার খোঁজ নিন্—কোথায় গেলেন।"

যে বৃদ্ধা প্রণবের সাহায্যে এ গাড়ীতে স্থান পাইয়াছিল, সে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি কেন মরতে এত লোক থাকতে তাঁকেই গাড়ীতে তুলে দিতে বলেছিলুম গো,—সে যে আমাদের দেশের সাত-আনার

জমীদারের ছেলে—তখন আমি কি জানি গো, দেশে গিয়ে আমি কি ক'রে মুখ দেখাবো গো,—তার মুখে একবার 'বুড়ি মা' কথা শুনে আমি যে আমার মরা ছেলের মা ডাক মনে করেছিনু গো।" ইত্যাকারে গগনভেদী চীৎকার করিয়া গাড়ীর বিপুল জনসঙ্ঘকে তাহার নিকট আসিতে বাধ্য করিতে লাগিল।

সদাশিববাবু দেওয়ানজীর কথা শুনিয়াই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রত্যেক গাড়ীর প্রত্যেক লোকের মধ্যে প্রণবের অনুসন্ধান করিবার জন্য গাড়ীর একদিক হইতে আর একদিকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি কোন গাড়ীতেই তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অবশেষে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিতে গেলেন। তথায় মাষ্টারবাবুকে দেখিতে পাইলেন না। একজন চাপরাসীর নিকট হইতে বহু চেষ্টার পর গ্রাম্ভারী আওয়াজে শুনিতে পাইলেন,—"সাব্ গাড়ীমে তদারক কর্‌নে গিয়া হৈ। একঠো বাঙ্গালী আদমী একঠো গোরা সাব্ কো জখম কিয়া হ্যায়। আউর তাজ্জব কি বাত হ্যায়, ওহি বেকুব আদ্‌মি আভি তক্ আপনা মুসে বোল্‌তা হ্যায়, 'হাম উস্কে জখম্ কর্‌কে বাঁধকে রাখা হ্যায়।' ক্যা বলেগা বাবু সাব্, দুনিয়া মে কেত্‌না তাজ্জব হোতা হ্যায়।"

সদাশিববাবু আসিয়াই যাহা দেখিলেন, তাহা যেন তিনি কল্পনার অতি দূরদৃষ্টিতে কখন আঁকিতে প্রয়াস পান নাই। এমনই এক প্রত্যক্ষ-দর্শন জীবিত চিত্র দেখিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিলেন অদূরে প্রণবকৃষ্ণ অসীম সাহসিকতার সহিত হস্তপদবদ্ধ সাহেবী পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে বাহুদ্বয় সাহায্যে শূন্যোপরি উত্তোলন করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের দিকে

আসিতেছে। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে প্রণবকৃষ্ণকে নম্র, ধীর, শোকার্ত্ত মূর্ত্তিতে দেখা গিয়াছিল, এখন আর সে প্রণব নাই। এখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল—পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া দেশ-জয়ের পরে, সে দেশের প্রজাকুলের প্রতি যথাকর্ত্তব্য সমাধা করিয়া, দেশের যত কিছু অশান্তি আর যত কিছু সার্থকতার তৃপ্তির ছবিতে নিজের শরীরের উপর জয়পতাকা অঙ্কিত করিয়া শান্তির রাজ্যে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার সঙ্গে বিরাট জনতায় মাষ্টারবাবুর ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শত চেষ্টা করিয়াও প্রণবের চতুষ্পার্শ্ব হইতে সে জনতা একেবারে অপসৃত হইল না। ষ্টেশন মাষ্টার সাহেব। বাঙ্গালা ভাল জানিতেন না। প্রণবের নিকট সমস্ত ব্যাপার ইংরাজিতে জানিতে চাহিলেন। প্রণব বলিল—"ইংরাজী কথাবার্ত্তায় আমি বিশেষ অভ্যস্ত নহি। তবে ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনাকে বুঝাইয়া দিবার মত ইংরাজী-জ্ঞান আমার আছে।"

সাহেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রণব বলিতে লাগিল—"মোগল-সরাই ষ্টেশনে অতিরিক্ত জনতার জন্য আমি চাকরদের গাড়ীতে উঠিতে বাধ্য হই। সে গাড়ীতে উঠিতেই আমাদের দেশীয় এক বৃদ্ধ আমাকে বলেন -'পার্শ্বের রিজার্ভ গাড়ীতে দুইটি ভদ্র-মহিলা বসিয়া আছেন ; গাড়ীর প্রথম চলন্ত অবস্থায় একটি মাতাল গোরা সাহেব টলিতে টলিতে জানালার ভিতর দিয়া ঐ গাড়ীতে উঠিয়াছে। দেখিয়া পর্য্যন্ত আমার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছে। দেখুন না বাবু, মেয়েরা সব এখন কি করিতেছে। সাহেবটাই বা কোথায় গেল ?' তাঁহার কথায় আমারও মনে একটা অতি অশুভ চিন্তা আসে, সেই চিন্তার আকর্ষণেই দৈব-প্রেরিত হইয়া

জানালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম—গাড়ীতে যে অল্প-বয়স্কা মহিলাটি বসিয়া রহিয়াছেন, তিনি জানালার উপর দুই হাতে ভর দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে আপনার দেহকে সঙ্কোচ করিয়া, সাহেবের পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সাহেব দুই তিনবার টানাটানির পর যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া সেই রমণীর দুই হাতের উপরেই বেশ জোরে দুইটা টান দিয়া দিলেন। রক্তাক্ত-হস্ত হইয়াও সেই নির্ভীকা নারী নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্য একতিলও নড়িলেন না। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার বিবেক-বুদ্ধি আমাকে পুনঃপুনঃ যেন অন্তরের মধ্যে বলিয়া উঠিতে লাগিল, 'আর্ত্তা রমণী—সহায়শূন্যা ; দুর্ব্বৃত্তের হস্তে বিপন্না হইয়াছে, অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—নারীর মর্য্যাদা রক্ষা কর, সতীর সতীত্ব রক্ষা কর, ইহাতে প্রাণ যায় যাক্, তবু নারীর মান —নারীর অমূল্য ধর্ম্ম রক্ষিত হউক'—এই বুদ্ধিতে আমার মনপ্রাণ নবশক্তিতে নিয়োজিত করিয়া আমি সেই মুহূর্ত্তে গতিশীল গাড়ীর বাহিরে যাইয়া অতি কষ্টে দুইটা জানালা পর পর অতিক্রম করিয়া ঐ গাড়ীর পা-দানির উপর দাঁড়াইতেই, এই উন্মত্ত সাহেব উপর হইতে স-বুট আমার মস্তকে এমন আঘাত করিল যে, আমি মাথা ঠিক করিতে না পারিয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ি। সাহেব বোধ হয় মনে করিয়াছিল, আমি নীচে পড়িয়া গিয়াছি। কিছুক্ষণ পরে আমি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাইয়া অতি দ্রুত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। উঠিয়াই দেখি, সাহেব নারীর উপর শেষ অত্যাচার মানসে তাহাকে নীচে ফেলিয়াছে। আমি ব্যাপার দেখিয়া সাহেবকে অতি ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলাম।

স্থান অস্থান বিবেচনা না করিয়া তুই চারি ঘুসি মারিতেই সাহেব জখম হইয়া পড়ে। জখম হইয়াও সাহেব অসুরশক্তি প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেনি। আমার দেহের উপরই সে সব চিহ্ন বিশেষরূপেই এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি কার্য্য উদ্ধারের আনন্দেই সে সব ব্যথায় কাতর হইতেছি না। প্রায় পাঁচ মিনিট মল্লযুদ্ধের পর আমি সাহেবকে বিশেষরূপে আহত করিয়া আমার চাদরে বেঞ্চের পায়ের সঙ্গে সাহেবকে বাঁধিয়া রাখিলাম। তার পর দেখিলাম, যুবতী রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া বেঞ্চের নীচে পড়িয়া গিয়াছে। কলের জলে কাপড় ভিজাইয়া মূর্চ্ছিতার মুখে দিতে দিতে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। ঐ গাড়ীতে যে বুড়ি রহিয়াছে তাহার নিকট গিয়া দেখিলাম, চৈতন্যনাশক ঔষধে সিক্ত একখানি রুমালে তাহার মুখ বাঁধা। রুমালখানি বোধ হয় এখনও কল-ঘরে আছে। পরে জানিতে পারিলাম এঁরা সিমলা পাহাড় হইতে আসিতেছেন। যুবতীর স্বামী একা দেশে আসিয়াই কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া এদের আসিবার জন্য 'তার' দিয়াছেন। সেখানে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কাহাকেও না পাইয়া, স্বতন্ত্র গাড়ী করিয়া, একমাত্র বৃদ্ধা তাহাতে আবার চিরবধির ঐ স্থবিরাটিকেই সঙ্গে লইয়া দেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। তার পর আর কোনও কথা আমি জানিতে সময় পাই নাই। গাড়ী এখানে আসিতেই আমি মহাশয়ের নিকটে আসিয়াছি।"

ষ্টেশন মাষ্টারের আদেশে, বদ্ধ-হস্তপদ গোরা সাহেব মুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিত হইল, এই যুবক যাহা বলেন, তাহা সত্য কি না?

গোরা সাহেবের তখনও মদের ঝোঁক পূরা মাত্রায় কাটে নাই। অথচ যাহা ঘটিতেছে সবই বেশ বুঝিতে পারিতেছে। এমনই অবস্থায় সে অনেক কথা অনর্থক কহিয়া যাইতেছিল। শেষে ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের ধমক খাইয়া সে উত্তর দিল,—"বাগে পেয়ে এতটা মূর্খ ভেব না যে, আমি এর অন্য দিক্ দেখিয়ে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্ত্তে পার্ব্ব না।"

মদ্যপের উক্তির একটা বিশেষ গুণ এই যে, দেশ কাল সব ভুলাইয়া দেয়। তাহার বাক্‌শক্তির জড়তাই সকলকে একটু আনন্দ দেয়। এক্ষেত্রে এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের বিভীষিকার মধ্যেও তাহার অন্যথা হইল না। সকলেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসিতে প্রকৃত ইংরাজ ষ্টেশন মাষ্টার যোগ দিতে পারিলেন না। গোরা সাহেবের দিকে তর্জ্জনী হেলন করিয়া অতি গম্ভীর কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন, "জাতির কলঙ্ক, মূর্খ, কালসাপ, তুমি তোমার মন্দ কার্য্যের ফল ভোগ করিবার জন্য হাজতের অন্ধকার গৃহে অবস্থান কর। সময়ে বিচারের অতি নিমম—অথচ অতি পবিত্র হস্তে তোমার জন্য নূতন শাস্তির প্রস্তাব যাহাতে হয়, তাহার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টিত হইব।

"আর সৎসাহসী ভদ্র যুবক, আপনি আপনার নাম ধাম জানাইয়া স্বস্থানে গমন করিতে পারেন। এত অল্প বয়সে—এত সাহস এ দেশের লোকের মধ্যে আমি আমার কর্ম্মজীবনে এইমাত্র প্রথম দেখিলাম। সৎ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আজ যে কর্ম্ম করিলেন, তাহার জন্য আমরা আপনাকে মুখে শত ধন্যবাদ দিতে পারি মাত্র, কিন্তু এ কার্য্যের যথাযোগ্য পুরস্কার ও যে পবিত্র আশীর্ব্বাদ পাইবার আপনি যোগ্য, তাহা ভগবান আপনার

কর্ম্মজীবনের উপরেই প্রদান করিবেন, এই প্রার্থনা করি। প্রত্যেক গাড়ীতেই সতর্ক করিবার জন্য যে শিকল আছে, তাহার ব্যবহার গাড়ীতে উঠিলেই সর্ব্বদা মনে রাখিবেন, অবশ্য অতি বিপদে মানুষের সবই মনে আসে না। চলন্ত গাড়ী হইতে বাহির হইবার জন্য দৈব যে আপনার সৎসাহসী জীবনকে বিপন্ন করেন নাই, তাহার জন্য ভগবানকেও ধন্যবাদ দিন। আর এক কথা, যখন এই অতি অপ্রিয় ঘটনার রহস্য সর্ব্বসমক্ষে সত্যরূপে প্রকাশ পাইল, তখন আর পর্দ্দানসীন একটি নিরীহ সম্ভ্রান্ত মহিলার এজাহারের কোনও প্রয়োজন দেখি না।” ষ্টেশন মাষ্টার সাহেব গাড়ীর নিকটে আসিয়া সেই মহিলাদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“মা লোক, প্রণববাবুকো তোমারা গাড়ীপর লেকে এক সং যাও। ডরো মাৎ, বাবু তোম্‌লোক্‌কো ছেলিয়াকা মাফিক্। মাতারিকো লেড়কা যেসা মাফিক্ সাথ লে যাতে হৈ, এসা মাফিক্ বাবু তোম্‌লোক্‌কো সাথ লে যায়েগা, ডরো মাৎ।”

সদাশিববাবু এখনও পর্য্যন্ত কোনও কথাই কহেন নাই,—যেন এই সব ব্যাপার চলন্ত চিত্রের মত দেখিয়া যাইতেছিলেন। প্রণবকৃষ্ণ সাহেবের কথায় কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল, সেই গাড়ীতে উঠিতে যেন সম্পূর্ণ ইচ্ছা নাই, এমন ভাব দেখাইতে লাগিল। তখন সদাশিববাবু বলিলেন,—“প্রণব, তুমি ওঁদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, তবে সাত-আনীতে গেলে বড় ভাল হয়। আর তোমার কর্ত্তব্য আমি নিজের কর্ত্তব্য মনে ক’রে সাত-আনীতেই যাচ্ছি। তোমার পিতা সেখানে না আসা পর্য্যন্ত আমি সাত-আনীতেই থাক্‌বো।”

৪

আবাল্যের বন্ধু সদাশিববাবুর বিপদের কথায় জ্ঞানানন্দবাবু নিজের বিপদ গায়ে না মাখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলেন। কাতরতা যে কাহাকে অধিক কাতর করিয়াছিল, তাহার বিচার বৃদ্ধ দেওয়ান সনাতনের ধারণায় যাহা হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি বলিলেন—"আপনাদের চিরদিনের সমান ওজনের কাজের মত ভগবান্ আপনাদের সমান শোকের মধ্যে ফেলেছেন ; তার জন্য দুঃখ কর্‌বেন না বাবুরা। আমি আপনাদের তিন পুরুষের কর্ম্মচারী, তাই সুখে-দুঃখে—সব তাতেই আমার কথা বল্‌বার একটি স্বত্ব মৌরুসী হ'য়ে গেছে। শূন্য ঘরে আপনাদের মন বস্‌বে না,—তাই বল্‌চি, বাবুরা যদি মনোযোগ করেন, তাহ'লে এই বুড়ো সনাতন মনের পুরানো ময়লাগুলো সব মন থেকে ফেলে দিয়ে, আবার নূতন মন, প্রাণ, শক্তি নিয়ে এই দুটো সত্বভাঙ্গা, শূন্য বাড়ী যোড়া দিয়ে আবার এমন একটা সাজান রাজবাড়ী ক'রে তুল্‌তে পারে যে, তা দেখে দেবতাদেরও চোখ ঝল্‌সে যাবে।"

সদাশিববাবু তাঁহার পিতার আমলের এই বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তা সেটা সেকালের রীতি নীতি অনুযায়ীই হউক, অথবা আধুনিক যুগের পক্ষে মনের অতি দুর্ব্বলতাতেই হউক, সে বিচারের ভার ভারতের ভাগ্যের কর্ম্ম-জীবনের উপরেই চিরতরে ন্যস্ত থাকুক। বর্ত্তমানে তাহার মীমাংসা করিবার অধিকার আছে কি না জানি না।

এই নব্যযুগের বাবুদের নিত্য-নব পরিচারকের নিত্য-নব সেবা-

গ্রহণ-পদ্ধতির আইন-কানুনের সঙ্গে আংশিক তুলনা করিলেই বোধ হয় অনেকটা বুঝা যাইতে পারে যে, সুখী ও কর্ম্মী কাহারা অধিক ছিলেন। তখনকার দিনে একটি লোক যে কোন বাড়ীতে আশ্রয়-গ্রহণ করিলে, বা চাকরী স্বীকার করিলে, তাহার বংশানুক্রমিক সেই বাড়ীরই পোষ্য মধ্যে চিরদিনের জন্য গণ্য হইত, বিশেষ স্নেহ বা ভক্তির পাত্রে পরিণত হইত; হয় ত বা একটা বিশেষ আত্মীয়ের তুল্য সম্বন্ধেই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ন্যায় আহূত হইত। এখনকার দিনের মত পাঁচ বৎসরের শিশু তার পিতামহের সমবয়সী সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ ভৃত্যকে যেভাবে নাম ধরিয়া—নাম ধরিয়া কেন নাম বিকৃত করিয়া ডাকে, তখন সে পদ্ধতি ছিল না। খাদ্য সম্বন্ধেও প্রভু-ভৃত্যের বিশেষ পার্থক্য হইত না। পুত্রের সমান আদরে ও শাসনে শত দোষের মার্জ্জনা করা, একটি অবনত জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আপন সংসারের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গণ্য করিয়া তোলাই সংসারের কর্ত্তার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাই সে যুগে বংশ-পরম্পরা এক কাজ করিতে বড় কেহ লজ্জিত হইত না। এক কাজের মধ্যেও মনের ও কর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যে বুদ্ধির বিকাশ ও কর্ম্ম-কৌশল আয়ত্ত হইত, তাহাতেই তাহাদের আপন আপন সংসারের সকল অভাব দূর করিবার ভার পড়িত—তাহাদের প্রভুর উপরে; এখনকার মত নিত্য-নব রুচির মনিবের পদলেহনে ভৃত্যের চরিত্র নেমক-হারামীর শেষ সীমায় যাইত না। মনিব-চরিত্রের সঙ্গ-দোষে চাকরের চরিত্রকে 'ছিঁচ্‌কে চোর' হইতে ডাকাত প্রস্তুত করিতে এযুগ যে সব সুযোগ দেয়, তখনকার দিনে সে সব কোন সুযোগই পাইত না। অর্থের রাশি—কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি থাকিলেও এখনকার

দিনে প্রকৃত সুখী—প্রকৃত ভোগী আদর্শ-গৃহী একজনও দেখিতে পাওয়া যায় না। তখনকার দিনে সংসারের যাবতীয় কর্ম্মে, সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধনে যাহাদের প্রাণ সতত নিয়োগ করা হইত, তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস, সত্য, মমতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান যতটা ছিল, এখন তেমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ? এ যুগের বড়লোক—ব্যাঙ্কের কাগজে, জীবন-বীমায়, সেভিংস্-ব্যাঙ্কে, গার্ডেন্-পার্টীতে, মোটারের দ্রুত-গতিতে। ব্যাঙ্কের কাগজে খাঁটি সুদই দেয়, কিন্তু সংসারের পক্ষে ভাবী বংশধরের জন্য যে খাঁটী দুধের দরকার তাহা দেয় কি ? ব্যাঙ্ক সুদই দেয় দুধ দেয় না। হাজার সুদের টাকা বাহির করিয়াও খাঁটী দুধ খাইতে পান কি ? জীবন-বীমায় বর্ত্তমান জীবনেই হউক বা জীবনের পরেই হউক, যখন হউক টাকার রাশি পাওয়া যাইবে, তাহাতে সংসারের পক্ষে —সংসারীর পক্ষে কোন অভাব দূর হইল কি ? টাকার গদিতে বসিয়া থাকুন বা টাকা উড়াইবার জন্য যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা উড়ান; দূর জ্ঞাতির লালন-পালনে যে জীবন-বীমা হইত, যে তৃপ্তির হিল্লোলে বর্ত্তমান জীবনে ও পরজীবনে প্রীতির বন্ধন করিয়া সংসার সুখে-দুঃখে সকলের সাহায্য পাইত, এখনকার জীবন-বীমায় তাহা দেয় কি ? চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁহার অঞ্চল দোলাইয়া কাহার শ্রান্তি কখন অপনোদন করিতে কোন্ স্থানে আগমন করিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি ? তাই সে যুগে খোঁজ করিয়া দরিদ্র দূর জ্ঞাতির—নিরন্নের—দীনজনের প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। প্রকৃতির পরিবর্ত্তন পদ্ধতির স্বভাবগুণে আজ যে রাজা, কাল সে প্রজা, আজ যে প্রজা, কাল সে রাজা, আজ যে দুঃখী, কাল সে সুখী হইবেই, তাই ভূয়োদর্শী

মহাজনগণ ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য বিশ্বাস, সত্য, মমতা, পরোপকার, কৃতজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া, সকলকে প্রীতির বন্ধনে—প্রেম রজ্জুর পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া সংসারের অভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া যাইতেন। এখন সারা বঙ্গে, ভারতে, আর সে প্রাণ—সে ভবিষ্যৎ-দর্শন আছে কি? কেন নাই? কেনই বা গিয়াছে? সংসারের নিত্য-নব অভাব অভিযোগ, অশান্তি যেভাবে আমাদিগকে বিপন্ন করিতেছে, তাহার মূল কারণ কে অন্বেষণ করিবে? 'ওগো আমাদের ভাগ্যদেবতা, বলিয়া দাও,—কবে, কখন, কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে তুমি আমাদের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া, প্রকৃত সংসারের কর্ত্তব্যপথে আমাদিগকে চালিত করিয়া, অনুশোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবে?

পুরাতন আজও নূতনের নিকট পরাজিত হয় নাই। উচ্চশিরে আদর্শের মত নিজের যোগ্যাসনে বসিয়াই আছে। আমরাই না শিক্ষার দোষে তাহার সে আসনের মর্য্যাদাকে পাগলের পাগলামী মনে করিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখি। এখনও বাঙ্গালার অনেক বনেদী-ঘরে বনেদী চালের—যাহাকে এ যুগ ঘৃণার চক্ষে দেখে, সেই ভাবের—ব্যবস্থা পূরা মাত্রায় দেখা যায়, ঠাকুর সেবার কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, বাড়ীর মেথরের কার্য্য পর্য্যন্ত করিবার জন্য পুরুষানুক্রমে যে ভাবে জমী জমা দিয়া ব্যবস্থা করা আছে, সেই ভাবেই অপর বংশের লোকও পুরুষানুক্রমিক এক কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তাহাতে তাহাদের কাহারও কখনও মর্য্যাদা-হানি হয় না। শিক্ষার সঙ্গে মনের গঠনে তাহাদের হৃদয় তখন যেভাবে গঠিত হইত, আজকালকার দিনের বিজাতীয় শিক্ষা ধর্ম্মহীন কর্ম্ম-শিক্ষা তাহাদের মনের গঠন হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া

দিতে পারে না। সেকালের প্রত্যেক কর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম হইতে শেষ-পর্য্যন্ত ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া যে কর্ম্ম করা হইত, এখন সে-সব কর্ম্ম প্রাণহীন ভাবে অভ্যাসের বশে মাত্র ভোগের জন্য করা হইতেছে। এখন আর কর্ম্মের সূচনায় সঙ্কল্প নাই, কর্ম্ম-সমাপ্তির বিপুল আগ্রহ নাই, কর্ম্মের উদ্দেশ্য নাই, কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হয় না। তাই এখনকার দিনে কর্ম্মের প্রকাশগতি কোন্ দিক দিয়া চলিয়াছে তাহা কে বলিবে? যে জাতির একমাত্র শিক্ষা ছিল—ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করাই আমাদের চিরন্তন প্রথা—আর তাহাই পরামুক্তির সোপান, আজ সেই জাতি কেবল ভোগের জন্য—অর্থের জন্য কর্ম্ম করিয়া নিজের কর্ম্মপাশকে এতই সুদৃঢ় করিতেছে যে, তাহা শতকোটী জন্মের কর্ম্মেও ছেদন করা সম্ভব হইবে না বলিয়াই মনে হয়। এই বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই দেশ ম্লেচ্ছাচারে নিমজ্জিত হইতেছে, দরিদ্র হইতেছে, বিলাসী হইতেছে। অথচ বিবেক-বুদ্ধির তাড়নায় দৈবদৃষ্ট সদাচারের শান্তি দেখিয়া নিজের গত জীবনের কর্ম্মের পরিণতিতে যে সব অশান্তির ফল তাঁহাকে গ্রাস করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। সর্ব্বশেষে বার্দ্ধক্যে যখন আর জীবন-স্রোত ফিরাইবার সময় ও সামর্থ্য নাই, কোনও উপায়ই রাখেন নাই, জীবনের জোয়ার ফুরাইয়া একটানা ভাটা কালের গতির সঙ্গে দ্রুতগতিতে বহিয়াছে; দক্ষিণ দ্বারের দ্বারীর আহ্বান শ্রবণে আসিতেছে তখন আর কি ফল হইবে? জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করিতে স্বেচ্ছায় পথ ও কর্ম্ম বাছিয়া লইতে শাস্ত্রের দিকে না চাহিয়া—ঋষিবাক্যে দৃঢ়-বিশ্বাস না আনিয়া—মহাজনের পথে না চলিয়া—অবিবেকীর মত সারা জীবন যে পথে চলিয়া—

যে সময় হাসিতে হাসিতে কাটাইয়া দিলে—জীবন-যুদ্ধে যে সময় চলিয়া গেল তাহাতে আর পবিত্র কর্ম্ম—আত্মোন্নতির কর্ম্ম—মানব-জীবনের পবিত্র কর্ম্ম-সাধনার ফল—নির্ম্মল শান্তি-ভোগ হইল কই? সম্পূর্ণ ভোগ করিতে না পারিলে—ত্যাগ হয় না। ভোগ ও ত্যাগ সমবায়-সম্বন্ধে আবদ্ধ। তখন বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, শরীর ও মন সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইলে, গুরুর আদেশে গৃহী হইত। সে গৃহী ভোগীর ও ত্যাগীর আদর্শ। সেরূপ ভোগী ও ত্যাগী এখন আর নাই। তাই ত্যাগ বলিলেই হয় ত এ যুগের সন্ন্যাসীর স্বভাব সংসারের মধ্যে আনিয়া আরও নিম্নস্তরের আদর্শ মনের মধ্যে পোষণ করিবে।

৫

বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে বাল্যকাল হইতে সদাশিববাবু দাদা বলিয়াই ডাকিতেন। বিপদে-সম্পদে তাঁহার সাহস ও কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া—তাঁকে নিজের জ্যেষ্ঠের আসনে বসাইতে কোন দিন দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই কয়দিনেই কালের করাল গ্রাসে সবই গিয়াছে, যতটুকু আছে, তাহার মধ্যে সনাতনেরই বার্দ্ধক্য শক্তি একাই সব অভাব পূরণ করিয়া আসিতেছে। এই বিধি-বিপত্তির মধ্যে তাঁহার যতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই সনাতন রায় সদাশিববাবুর বন্ধু, সখা, ভৃত্য ও গুরুর আসন অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

সেই প্রাণপোরা বিশ্বাসে—ভালবাসায় মুগ্ধ সদাশিববাবু সনাতনের কথার কি প্রতিবাদ করিবেন? তাই বলিলেন—"দাদা, যাতে দশের তৃপ্তির সঙ্গে আমাদের তৃপ্তি হয়—শান্তি পাই,

সেই মত ব্যবস্থা কর। আমাদের শোকে সান্ত্বনা দিতেও এখন তুমি—আর সুখে আমোদ কর্ত্তেও তুমি, বিপদের সহায়, সম্পদের বিভব, প্রাচীনের গৌরব তুমি—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।”

সনাতন বলিলেন—“আমার ইচ্ছা যে, প্রণববাবুর সঙ্গে মায়ার বিবাহ দিয়ে সাত-আনী আর নারায়ণপুরের মাঝের সীমানা তুলে দিয়ে এ দুই জিনিস—মানুষ থেকে আরম্ভ ক'রে, জায়গা জমী পর্য্যন্ত সব এক ক'রে দিই। তাদের সুখে শান্তিতে ভাসিয়ে দিয়ে, আমরা সব বুড়োর দল অন্তে কাশীবাস করি। জ্ঞানানন্দবাবুর যদি কোনও প্রকারে অমত না হয় তবে শুভকর্ম্ম শীঘ্র সেরে ফেলুন।”

জ্ঞানানন্দবাবু বলিলেন—“আজ কালকার রীতি-নীতি অনুযায়ী আমার মতামত নেবার আগে একবার ছেলের মন বুঝে দেখাই উচিত ব'লে মনে হচ্ছে। প্রণবের বয়স হয়েছে—বাইশ বৎসর। নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর দাঁড়াইতেই যেন সে ইচ্ছুক।”

সনাতন বলিলেন—“বাবু, আমি এখন যে কথাই বলি না কেন, উভয় পক্ষের ঘটকের কথার সমান ধ'রে আমাকে মার্জ্জনা কর্ব্বেন। আমার মুখে এত বড় কথা অনেকদিন বার হয় নি, কিন্তু আর থাক্‌তে পার্চ্ছি না। তাই, সব ব'ল্‌তে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের বিবাহের সময় কি আমাদের মা বাপ কখনও জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ‘ওরে তোর বিয়ে কর্‌বার ইচ্ছা আছে কি? অমুককে বিয়ে কর্ব্বি কি না?’ এ সব হচ্ছে সমুদ্র-পারের কথা—এ সব এখানে খাটে না, এখানে বাপ ছেলের বিবাহ দেয়, নিজের মতে পছন্দ ক'রে বিবাহ করে না। নিজের উপর কর্ত্তৃত্ব করা আমাদের দেশের পক্ষে ভাগ্যের কথা নয়। অভিভাবক থাকা

সত্ত্বেও যাহাকে কর্ত্তৃত্ব করিতে হয় সে ভাগ্যবানও নহে। নিজের দায়িত্ব ও নিজের অধিকার নিজে নির্ব্বাচন করিতে পারে এমন শক্তিশালী পুরুষ বা নারী ভারতে অনেক থাকিতে পারেন—কিন্তু এই শক্তির উপর অধিক মর্য্যাদা দিতে বাধ্য, মর্য্যাদা কেন আপনাকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য বা উৎসর্গ করিয়াই ধন্য—এমন জাতি, এমন শক্তি এই কর্ম্মভূমি ভারতেই আছে, অপর দেশে নাই। এমন আদর্শ কর্ম্ম—চিরন্তন প্রথার বিরাট মর্য্যাদা যে পিতা স্বেচ্ছায় পুত্রের হস্তে তুলিয়া দিতে পারেন তাঁর কর্ত্তব্য ও তাঁর পুত্রের কর্ত্তব্য একদিকে একই কেন্দ্রপথে কর্ত্তব্যের আহ্বানে চালিত হইতে পাবে কি না তাহা নির্দ্দেশ করা বড়ই দুরূহ। এমনই কত ক্ষুদ্র বিরাট ঘটনায় শতশত পিতৃমর্য্যাদা খর্ব্ব হইয়াছে, শতশত পুত্র পিতার স্নেহনীড় ত্যাগ করিয়া কামনা বাসনার করাল গ্রাসে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহার সীমা কে করিবে? এখানে বংশগত সম্বন্ধ পুরুষানুক্রমিক কর্ম্ম বজায় রাখিবার ভার পুত্রের উপর। পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পুত্রের প্রয়োজন। পিতৃ-শোণিতে জন্ম—পিতৃ-কীর্ত্তিতে মুগ্ধ পিতৃভাবে ভাবাপন্ন পুত্রই পিতার ইহ-পর জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে পারে। পারে বলিয়াই আজও ভারতের সনাতন ধর্ম্মের দ্বারে সনাতন আচার ব্যবহারের আশ্রয়ে বিশ্ব-জগতের সকলেই আশ্রয়প্রার্থী ভিখারীর ন্যায় দণ্ডায়মান। এই বিলাসের যুগে তাঁহার অস্থি-কঙ্কাল-সার অতি জীর্ণ মৃতপ্রায় জীবনেও আমরা—সেবার পরিবর্ত্তে যে শাস্তি, আচারের বিনিময়ে অনাচার, ধর্ম্মের বিনিময়ে যে অধর্ম্ম, শান্তির বিনিময়ে যে অশান্তির অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি—তাঁহার পবিত্রতার হানি করিতেছি—

তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া, তাহার অভাব পূরণ না করিয়া, যতটুকু শেষ ক্ষীণ প্রাণ আছে তাহা নষ্ট করিতে আমরা পাশব শক্তির পরিচয় আর কত বেশী দিতে পারিব? সনাতন-ধর্ম্ম নিজের দেহ প্রাণ তাঁহার সেবকদের দ্বারা কোটী কোটী খণ্ডে বিভক্ত করিয়াও পুরুভূজের প্রাণের মত এখনও যে জীবিত রহিয়াছেন, তাহা এই সারা ভারতের প্রত্যেক ত্যাগ-ধর্ম্মের শক্তিতে। এখানেই স্বামীর মুখ চাহিয়া, স্বামীর সুখে সুখী হইয়া পত্নী নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার নিজের বলিতে মনের কোন স্থানে এতটুকু ইচ্ছা-শক্তিও রাখেন না। সারা জীবন—জীবন বলিলে ভুল হয়, মুক্তির দ্বারে পেঁাছিতে যত কোটী জন্ম জীবন ব্যয় হউক না কেন—তৃপ্তিতে, মনের পূর্ণ আনন্দে, অতি বড় পাষণ্ড স্বামীরও পদতলে পড়িয়া থাকিতে চান। সতী স্বামীর সঙ্গ, স্বামীর মঙ্গল, স্বামীর সর্ব্ব-মঙ্গল কামনা করিতেই নিজের অস্তিত্বটুকু কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কালের ইঙ্গিতে সনাতন ধর্ম্মের অতি বিরাট অথচ অতি সূক্ষ্ম গতি আয়ত্ত করিয়া ত্যাগধর্ম্মের—আত্মত্যাগের—আত্মোৎসর্গের বিজয়মঙ্গলগীতি ভারতের প্রত্যেক প্রাসাদ হইতে প্রত্যেক পর্ণকুটীরে কেন গীত হইতেছে, তাহা কে বলিবে! আমরা পিতার আদেশ—পিতৃকর্ম্ম পিতৃ-ইচ্ছা পূরণ করিতেই এ কর্ম্মভূমিতে আসিয়াছি, নিজের ইচ্ছা, সুখ, শান্তি, সবই পিতৃ-মাতৃপদে সমর্পণ করিয়া, প্রত্যেক কর্ম্ম-জীবন অতিবাহিত করিতেছি—সেই ত্যাগ-ধর্ম্মের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছি বলিয়াই। এই ভাবেই ভারতের সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়ে আমাদের পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়াছেন। আবার আমরাও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শ্রদ্ধার দান মন্ত্রশক্তিতে গ্রহণ

করিয়া শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র পিতৃলোকে স্থান পাইব। সুকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্মের বন্ধন—সংস্কার-পাশ হইতে চিরমুক্ত হইব—ইহা দেবা-দেশ—ইহা ঋষিবাক্য—ইহা চিরন্তন সনাতন প্রথা—সনাতন ধর্ম্ম। ইহা উজ্জ্বল আলোকের অক্ষরে লিখিত শাস্ত্রবাক্য—ঋষিবাক্য। আমাদের ভবিষ্যৎ আশা কখনই যেন কাহাকেও ত্যাগ করিতে না দেখি। কোন্ পুণ্যযুগের আদিতে এই প্রথা—এই সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, এই অক্ষয় রীতি নীতি, অমিতগতি কালের নিত্য নূতন গতির উপর দিয়াও অতি পুরাতন হইয়া চলিয়া আসিতেছে—বিশ্ব-সংসার যাঁহার নিকট নতশিরে বসিয়া আছে—তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি স্বয়ং বিধাতারও নাই! এই কর্ম্ম-ধর্ম্ম-শক্তি নিয়তি হইতেও কঠোর—সত্য হইতেও ধ্রুব—বেদ ও নারায়ণ হইতেও অতি পবিত্র।"

বৃদ্ধ দেওয়ান সনাতন রায় নিজের জ্ঞান বুদ্ধির শক্তিতে আজ যে সব কথা বলিলেন, তাহার উপর তর্ক করিতে, বিচার করিতে জ্ঞানানন্দবাবু ও সদাশিববাবু সাহস পাইলেন না। কিছুক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক্ থাকিয়া, যেন অতীতের পুণ্য-গরিমা স্মরণ করিতে লাগিলেন। সেকালের সঙ্গে একালের শিক্ষার পার্থক্য যে কত বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জ্ঞানানন্দবাবু বলিলেন, "দেওয়ানজী, আপনার হাতে-গড়া,—মানুষ-করা মায়াকে—সদাশিবের স্নেহের বন্ধন মায়াকে আমার প্রাণের অধিক ভালবাসার ধন—আমার বংশের একমাত্র শেষ সম্বল প্রণবকৃষ্ণের বধূরূপে—আমার একমাত্র পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলাম। আর এক কথা, সে কথা যতই অপ্রাকৃত হউক না কেন, দিতেই

হইবে। সদাশিব, ভাই, আমার একমাত্র প্রার্থনা, ভিক্ষা, অনুরোধ, এ বিবাহের যৌতুকরূপে যাহা কিছু দিবে, তৎসমুদায়েরই পরিবর্ত্তে এই একমাত্র অশীতিপর বৃদ্ধকে—সে কালের শিক্ষার পূর্ণমূর্ত্তি এই দেওয়ানজীকে, তোমার ভাবী জামাতার অভিভাবক-রূপে বিবাহের মাঙ্গল্য-সূত্রের সঙ্গে বন্ধন করিয়া বরবধূর সঙ্গে পাঠাইয়া দিবে। এই বৃদ্ধের স্নিগ্ধ শান্ত হাস্যোজ্জ্বল প্রশান্ত হৃদয়ের কর্ত্তব্যজ্ঞানের শীতল ছায়ায় বসিয়া তাহারাও যেন এই আদর্শ লইয়া প্রাচীনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে—সেবা করিতে—অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে—তাহাদের অমূল্য প্রাণ এই বৃদ্ধেরই আদেশে পরহিতব্রতে ব্যয় করিয়া, আমাদের বংশ উজ্জ্বল করে।"

৬

জ্ঞানানন্দ বাবুর ভগিনী—নন্দরাণী ভ্রাতৃজায়ার চন্দনধেনুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একমাত্র পুত্র সুধীরকে সঙ্গে লইয়া সাত-আনীতে আসিয়াছিলেন। মায়ার সহিত সুধীরের ঘনিষ্ঠতা এই কয়দিনেই এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাতে কেহই বুঝিতে পারিত না যে, ইহাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা নাই—এইমাত্র কয়দিনের পরিচয়। খাওয়া-শোওয়া, গল্প-গুজব সবই পরস্পরের একসঙ্গে হওয়া চাই। কেহ কাহারও সঙ্গ ক্ষণেকের জন্যও ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে। সদাশিববাবু একদিন প্রাতঃকালে নারায়ণপুরে প্রত্যাগমনেচ্ছা জ্ঞানানন্দবাবুকে জ্ঞাপন করিলেন। সেইদিনেই মায়া চলিয়া যাইবে শুনিয়া নন্দরাণী দেওয়ানজীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আজ তো কিছুতেই যাওয়া হ'তে পারে না, ক'দিনই কাজের গোলমালে মায়াকে, আমি একবারও দেখ্‌তে পাইনি।

দুচার দিন পরে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। দাদা-বাবুকে আপনি বলুন, এখন যাওয়া হ'তেই পারে না। বিশেষ, মায়া চ'লে গেলে, ঐ দস্যি ছেলে সুধীরের জ্বালায় আমাকেও শিগ্রি চ'লে যেতে হ'বে। মায়ার সঙ্গে বেশ মিলেমিশে আছে, আমাকে কোন ঝক্কিই পোয়াতে হচ্চে না। আর মায়াও বেশ হাসিমুখে সুধীরকে নিয়ে বাড়ীময় খেলা ক'রে বেড়াচ্চে, এই সময়টা একটু অন্যমনা হ'য়ে থাক্। বাড়ী গিয়ে আবার সব কথা মনে প'ড়ে মুখটি ভার ক'রে থাক্‌বে। যদি এখানে থাকার জন্য মায়ার মনের মধ্যে কোন কষ্ট হচ্চে বুঝ্‌তে পার্‌তাম, তাহ'লে আমি এ জেদ কখনই কর্‌তাম না। মায়াকে দেখে ওর ব্যবহার—কথাবার্ত্তা শুনে আমিও খুব আনন্দিত হয়েছি। মনে মনে কত আশাও কচ্চি, আমার সব কথা এখনও আপনাদের বল্‌বার কোনও সুবিধে পাই নি।"

বৃদ্ধ দেওয়ানজী নন্দরাণীর কথায় আনন্দের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "দিদি, তাই হবে। তোমার হুকুম না পেলে এখন আর আমরা এ বাড়ী হ'তে যাচ্ছি না। যদি দৈবচক্রে তোমা হ'তে মায়ের স্নেহ, ভগিনীর প্রীতি সবই পাচ্ছি, তবে তা হেলায় হারাবার ইচ্ছা অতিবড় পাষণ্ড আমারও নাই। বিশেষ যখন তোমার যত্নে মা-হারা মায়া ও প্রণব দুজনেই মায়ের অভাব ভুলে আছে। তাদের সে সুখ থেকে বঞ্চিত করতে আমার তত ইচ্ছে হচ্চে না। দিদি, তুমি বা ক'দিন নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে এমন ক'রে এখানে থাকতে পার্‌বে! হরিপুর হ'তে তোমার আবার ডাক এই কবে আসে দেখ, ডাক্ পড়লেই তো আমাদের ফেলে রেখে চলে যাবে! তখন ত আর আমাদের

দিকে একবারও ফিরে চাইবার সময় পাবে না। আজ না হয় আমরা না গেলাম, কিন্তু আর একদিন যেতেই হবে যে দিদি !"

নন্দরাণী সলজ্জ হাস্যমুখে বলিলেন, "দেওয়ানজী, আমি যদি না যাই, আপনারা যাবেন না তো ?"

"না দিদি, তুমি জন্ম জন্ম সেখানে যাও, তোমার না যাওয়ার কথা যেন আমাদের কোনদিন ভাব্‌তে না হয়। আমরা যতই কেন স্নেহ-যত্নের কাঙ্গাল হই না, তবুও কখনও কোন দিন যেন এভাবে তোমাকে আমাদের মধ্যে পেতে না হয়। স্বামীর ঘরের মান, মর্য্যাদা, যশ অক্ষয় হোক্। স্বামীর আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীরও আয়ু বৃদ্ধি হোক্ এই আমাদের প্রার্থনা। নিজেদের অভাবের দিকে চেয়ে, তোমাকে আমরা এখানে এভাবে কয়দিন বা রাখ্‌তে পারি দিদি ! তাতে আমরা একটুও সুখী হ'ব না। তোমার সাজান সংসারের মত আমাদের এই ভাঙ্গাবাড়ী ছুটো সাজিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে তুমি তোমার বাড়ী চ'লে যাও দিদি। এর বেশী চাইবার আমাদের আর কিছুই নাই।"

"দাদাকে আজ প্রণব ও মায়ার বিবাহের কথাই বল্‌বো। আপনি মায়াকে আমাদের দেন। আপনি যদি মত দেন তা'হলে নারায়ণপুরের দাদাবাবুর অমত হবে না।"

"দিদি, মত দেওয়া কি—আমিই যে এতক্ষণ ধ'রে বাবুদের কাছে সদরে এ বিবাহের ঘটকালী কচ্ছিলাম। দিদি, তোমার আমার একমত। বাবুদেরও এ বিবাহে অমত নেই। এক বছর পরে—কালাশৌচ গেলে পর বিবাহের দিন স্থির হবে। আজ পরস্পরের বাক্‌দান এক প্রকার হ'য়ে গেছে।"

সনাতন ও নন্দরাণী উভয়ে বিবাহের নানা কথাবার্ত্তা

কহিতেছেন, এমন সময় সেখানে ম্লানমুখে সুধীর আসিয়া কহিল,—"মা, মায়াদিদি আমার সঙ্গে আড়ি দিয়েছে, কথা কচ্ছে না। মুখ ভারি ক'রে বাগানে ব'সে রয়েছে। মা, তুমি বল না আমার সঙ্গে কথা কইতে। আর আমি দুষ্টু হব না।"

"কখনও দুষ্টু হবে না—কখনও দুষ্টুমি কর্ব্বে না ত?"

"না, আমি খুব ভাল হব। আমার দোষ কি শোন না, আমি দিদিকে বলেছি,—'তুমি যে মালা গেঁথেছ, কাকে দেবে? তোমার যে বর হবে, তাকে?' এই কথায় দিদি বল্লে—'তুমি বড় দুষ্টু, তোমার সঙ্গে আড়ি'।"

"ও, এই কথা! তুমি তোমার মায়াদিদিকে বলগে—তুমি যদি আমার সঙ্গে আর কথা না বল, তবে তোমাকে আর কখনও দিদি ব'লে ডাকবো না; আর তোমাকে আমার বৌদিদি হ'য়ে আমার সঙ্গে সেধে সেধে কথা কইতে হবে।"

"মা, তবে বলিগে, যে তুমি, দিদি হ'য়ে রাগ কর, আর বৌদিদি হ'য়ে কথা কও।"

"তাই বলগে।"

মায়ের কথায় সরল হাস্যের লহরী তুলিয়া দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সুধীর বাগানে আসিয়া দেখিল, মায়া মালা গাঁথা বন্ধ করিয়া শ্বেত পাথরের বেদীর উপরে—ঝরা শেফালি ফুলের রাশি লইয়া সাজাইয়া সাজাইয়া শ্রীশ্রীদুর্গা নাম লিখিয়াছে। আর তাহার নীচে খড়িতে লিখিয়াছে—

সেবিকা শ্রীমতী মায়াদেবী।

সুধীর অনেকক্ষণ দূর হইতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার উপর নানাবর্ণের ফুল সাজাইয়া সাজাইয়া মায়া নিজের নামটি

দুর্গানামের মত ফুল দিয়া লিখিতেছে। বাগানের যত সব ফোটা ফুলই বাতাসময় সুবাস ছড়াইয়া, নিজের অরণ্যবাস-কাহিনী জগৎময় প্রচার করিয়া, সাধারণের মনোরাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য বাতাসের সঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া, যেন ছোট শিশুর মত ঘাড় নাড়িয়া কত কল্পনা-জল্পনা করিতেছে। আর পুষ্পরাণী মায়াকে যেন ইঙ্গিতে বলিতেছে, আমাদের তুলিয়া লইয়া ঐ নাম-সংস্পর্শে ফুলজীবনের সার্থকতা করিয়া দাও। আমরাও যেন ফুলে-গড়া ঐ নাম-মাহাত্ম্যে জীবন দিতে দিতে অনন্তের পথে সুবাসের মত চলিয়া যাইতে পারি। ওগো সুন্দরীর সুষমা, আমাদের বঞ্চিত করিও না, তোমারই পদ্ম-হস্তে আমাদের বন্যজীবনের পাশ ছেদন কর। দেবতার নামে চরণে অর্পণ কর।

সুধীর সেই নব-ফোটা ফুলের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য—কথা কহিবার জন্য, তাহাদের প্রত্যেকের বোঁটারূপ স্কন্ধটি ধরিয়া বলিতে লাগিল—"ও ভাই বেলফুল, ও ভাই যূঁইফুল, ও ভাই গোলাপ, তোমরা সবাই শোন—আজ যে দিদি আড়ি দিয়ে রাগ ক'রে আমার সঙ্গে কথা কচ্ছে না, সেই একদিন আমার বৌদিদি হ'য়ে আমার সঙ্গে কথা কইবেই।"

"সুধীর!" খুব গ্রামভারী আওয়াজে মায়া বেদীর উপর হইতে বলিল, "সুধীর, বেশ ভাই, আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি, কিন্তু ও কথা আর কখনও বল্‌বে না বল।"

"তা কেন, আমি ত মাকে ব'লেছি যে, দিদি আমার সঙ্গে কথা কচ্ছে না। মা আমায় ব'লে দিয়েছেন এই কথা বল্‌তে—তোমার দিদিকে বলগে, তুমি দিদি হ'য়ে রাগ কর, আর বৌদিদি হ'য়ে কথা কও। মা বল্‌তে বলেছেন, আর আমি বল্‌ব না!

তা কেন? আমি তো ফুলদের সঙ্গে কথা কচ্ছি, আমি তো আড়ি দেওয়া লোকদের সঙ্গে কথা কচ্ছি না, আমি বাগানময় সব ফুলদের ব'লে বেড়াব যে, 'আজ যে দিদি হ'য়ে রাগ কচ্ছে,—সেই একদিন বৌদিদি হ'য়ে সেধে সেধে কথা কইবেই।"

সাত আট বৎসরের বালক সে আর কি বুঝিবে—এই কথা কাহার মর্ম্মে কিরূপভাবে প্রবেশ করিতে পারে। সুধীর দেখিল, তাহার মায়াদিদি এই কথা যতবার শুনিতেছে, ততবারই ব্যাকুল-ভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে, আর বলিতেছে, "এ কথা এখনি কেহ শুনিতে পাইলে তাহাকে দুষ্টু বলিবে—শয়তান বলিবে—আরও কত কি বলিয়া নিন্দা করিবে।" কিন্তু সে এইমাত্র বুঝিল যে, যাহার সহিত আড়ি, সেই যখন এই কথা শুনিয়া কত রকম খোষামোদ করিয়া তাহার সহিত ভাব করিতে ব্যস্ত—তখন আর অপরে যাহাই বলুক না কেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে সে জানে। অপরকে শাসন করিতে হইলে ক্রন্দন করিতে করিতে বিছানার বালিস উঠানের নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিতে, ধোয়া বাসনে ধূলা বালি দিতে, মা'র ভাঁড়ার ঘরের জিনিস পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে, পরণের কাপড় দাঁতে কাটিতে, অবশেষে সর্ব্বাঙ্গ নগ্ন করিয়া মাটির উপর গড়াগড়ি দিতে, তাহার সমান আর কাহাকেও কেহ কখনও দেখে নাই।

বীরদর্পে পদক্ষেপ করিতে করিতে সুধীর বাগানের যত সব ফোটা ফুলের গাছের নিকট গিয়া, বিরাট অভিজ্ঞতায় অতি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ আশার কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুধীর তাহার ভবিষ্যৎ আশার কথা ছোট বড় প্রত্যেক ফুলগাছকে বলিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না। মায়াও শত কাকুতি-

মিনতিতে শত প্রলোভনে তাহাকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। প্রায় আধ ঘণ্টা এইরূপ ঝগড়া করিয়া, সুধীর বোধ হয় শ্রান্ত হইয়া কতকগুলি ফোটা, আধফোটা, সাদা, লাল, একরাশ ফুল কোঁচার কাপড়ে সঞ্চয় করিতে করিতে বলিল, "আমিও ফুলের লেখায় এ কথা লিখিয়া রাখি। আমার নামও লিখিয়া রাখিব!" মায়ার সম্মুখের কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপরে ফুলের রাশি ঢালিয়া খড়ির জন্য বেদীর চারিদিকে একবার তীব্র অনুসন্ধান-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজেই বলিল—"আর ত কোথাও খড়ি পাব না—যাই দাদার পড়ার ঘর থেকে খড়ি আনি, নেই বা কেউ দিলে।" বাড়ীর দিকের পথে একটু যাইয়াই একটা লোহার ছোট্ট কাঁটা পেরেক দেখিয়া বলিয়া উঠিল— "এতেও লেখা হ'তে পারে—তবে পাথরে দাগ হবে—তা হ'ক, এখানে কেউ আমাকে বকে না—এতেই হবে।" তারপর যেমন কথা তেমনই কাজ। সুন্দর মসৃণ করা পাথরের উপর সেই শান্ত শিষ্ট সুবোধ সুধীর প্রজাপতির বিধিলিপির উপরেও বুঝি নিজের অভ্রান্ত ধারণা লিখিয়া দিল—"আজ যে দিদি হ'য়ে রাগ কচ্ছে, সেই একদিন বৌদিদি হ'য়ে সেধে কথা কইবেই।" তারপর পূর্ব্ব-সঞ্চিত নানাবর্ণের ফোটা আধফোটা ফুলের রাশি লইয়া সেই খোদিত রেখার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়া ফুলের লেখা করিয়া দিয়া হাততালি দিয়া সুর করিয়া নাচিয়া গাহিয়া মায়ার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার এ লেখা তোমার চেয়ে খুব ভাল হয়েছে। তোমার সাদা ফুল সাদা পাথরে মিশে গেছে। আমার লেখা কাল পাথরের উপরে খুব মানিয়েছে। তুমি হার স্বীকার কর, তবে আমি চুপ করবো।"

মায়া বলিল—"তুমি ফুলের লেখা মুছে ফেল, তবে আমি ভাব কর্ব্বো, তা না হ'লে আমি কথা কব না।"

এমন সময় প্রণবকে দেখিয়া মায়া ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল। সুধীর তাহার সেই ভবিষ্যৎ বার্ত্তা দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করিতে লাগিল। সুধীরের সে কথা ও হাস্য-লহরী প্রণব ও মায়ার কর্ণে এক সঙ্গে একই ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল কি না, তাহা তাহাদিগকে আর একদিন জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

জ্ঞানানন্দবাবুর স্বর্গীয় পিতামহ অচ্যুতানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সময় এই সাত-আনীর নামকরণ হয়। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভবানন্দকে পৈতৃক সম্পত্তির নয় আনা দিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে নয়-আনীর জমীদার বলিত ও তাঁহার আবাস-ভবনকে নয়-আনী বলিত। কনিষ্ঠ হরানন্দ সাত আনার অংশ পাইয়া সাত-আনীর জমিদার ও তাঁহার আবাস-ভবন সাত-আনী নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। কি কারণে যে দুই ভায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত ও এখনও নয়-আনী সাত-আনীতে বহু দূর জ্ঞাতির জ্ঞাতিত্বের মত মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া আছে, তাহা কেহই জানে না। লোকমুখে অনেক কথাই প্রবাদ বাক্যের মত চলিয়া আসিতেছে। এখন নয়-আনীর জমীদার নব্যশিক্ষিত যুবক দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি বি-এ পাশ করিয়াছেন। দেশে প্রবাদ, আর পড়াশুনা করা হইবে না। উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাবে জমীদারী একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। নিজের কর্ত্তৃত্বে সেই সব মহল মজকুর দেখিবেন। এবং দেশের যতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে পারেন, তাহার জন্য রাস্তা ঘাট ইত্যাদির দিকে নজর দিতেছেন। শিকারে তাঁহার এত আনন্দ ও অধ্যবসায়

যে, সেকালে কোনও ক্ষত্রিয় সন্তানের তেমন নৃশংস শিকার প্রবৃত্তি ছিল কি না, তাহা কোন ঋষি কোন পুরাণে লিখিয়া যান নাই।

প্রাতে অশ্বারোহণে বাড়ীর বাহির হইয়া দামোদরের বাঁধের ধারে নানা জাতীয় পক্ষিকুল বিনষ্ট করা তাঁহার একটা দৈনন্দিন কার্য্য। তাঁহার বিশাল চক্ষু দুইটি যেমন অব্যর্থ সন্ধানের সহায়তা করিয়া, পক্ষিকুলের ভীতি উৎপাদন করিত, তেমনই এই দামোদরের তীরে ছোট ছোট পল্লীর নরনারীর প্রতি অতি কুৎসিত দৃষ্টিপাতে যে শিকার-বাসনা তাহার মনের মধ্যে উঠিত, তাহাতে তাহারাও কম ভীত হইত না। নদীর বাঁধের নীচে অনেক পল্লীতে তেমন ভাল জলাশয় না থাকাতে প্রত্যেক গৃহস্থের ছোট বড় ছেলে-মেয়ে— সকলেই নদীর ঘাটে আসিয়া স্নান করিত। পল্লীগ্রামে পুরুষেরা স্বভাবতঃই বেলায় স্নান করেন। মেয়েরা প্রাতঃকালেই স্নান করেন। স্নানান্তে আদ্র বস্ত্রেই জলপূর্ণ কলসী লইয়া বাড়ী যান। এ দেশের এই দরিদ্রতার যুগে—ইতরভদ্র সকলেই অসঙ্কোচে নদীর ধার হইয়া, গ্রামের মধ্যে সদর রাস্তা দিয়া বাড়ী যান। ইহাতে কে কাহার নিন্দা করিবে—সকলেরই অবস্থা সমান। যাঁহার বা একটু ভাল অবস্থা, তাঁহার ভাগ্যে এ কার্য্যের জন্য লোক মেলা অতি দুর্ঘট। দেবনারায়ণবাবু প্রতিদিন প্রাতঃকালে নদীর ধারে, সাধারণের স্নানের ঘাটের নিকট ছোট ছোট ঝোপে বসিয়া কখনও নানাপ্রকার শিকারে ব্যস্ত থাকিতেন, কখনও বা শিকার-ক্লান্তি অপনোদন জন্য মৃত পক্ষিকুলকে উপাধান করিয়া পথিপার্শ্বে শায়িত থাকিতেন। প্রবলপ্রতাপ জমীদার এই অল্প কয় দিন দেশে আসিয়া, সমস্ত

পুরাতন প্রবীণ কর্ম্মচারীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া নিজের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য হইতে পছন্দ করিয়া জমীদারীর কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এখন আর সেকালের মাথা লইয়া কোন কাজ করা চলে না। নূতন রক্তে জন্ম—নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত—নবীন উত্তমে উন্মত্ত যবকের দ্বারা যত কাজ পাওয়া যায়, প্রবীণের মস্তিষ্ক-বিকৃতির অবস্থায়—সেকালের সেই অতি পুরাতন লোক লইয়া তাহা কখনই হইতে পারে না। নিজের ধারণামতে নব্য-সম্প্রদায় নব্য-যুবকদের সঙ্গে লইয়া যত ভাল কাজ করিয়াছেন, আবার তত বেশী মন্দ কাজ করিতে কোনদিনই কুণ্ঠিত হন নাই। দেশের লোক সেই ভয়ে এই খামখেয়ালী যুবকের সম্পর্ক হইতে যতটা পারেন, নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই যে প্রতিদিন নদীর স্নানের ঘাটের মধ্যে আশে-পাশে—ঝোপে-ঝাপে বসিয়া, তাঁহার অব্যর্থ অনুসন্ধান-দৃষ্টিতে ইতর-ভদ্র সকল ঘরের নারীর মধ্যে কি শিকার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহার কৈফিয়ৎ কে চাহিবে? দেশের রাস্তা ঘাট ভাল করিয়া দিয়া প্রথমে তিনি যতটা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন—এখন তাঁহার তেমনই দুর্নাম—অপযশ সকলেই করিতেছে।

তার পর একদিন গ্রামের সব প্রবীণের দল বাবুর কাছারীতে যাইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাদের অভিযোগ অতি মিনতি করিয়া জানাইলেন।—'বাবু, যদি শিকার করিতে হয়, তবে ঘাটের পথ ছাড়িয়া বন-জঙ্গলের মধ্যে শিকার করুন। এখানে আপনি প্রতিদিন শিকারে আসিলে, আমাদের মেয়েদের বিশেষ অসুবিধা হয়। গ্রামের মধ্যে স্নান ও পানের জল নাই, আমাদের যে না খাইয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে।'

বিশেষ আদর-আপ্যায়নের পর বাবু বলিলেন,—"দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা না থাকায়, তোমাদের এই সব কুসংস্কার চিরদিন সমানভাবে তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এখন সে দিন—সে যুগ নাই। এখন স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের যুগ চলিয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষিত দেশেই এখন নারী-মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য অবরোধ-প্রথা তুলিয়া দিয়াছে। তোমাদের অন্ধ সংস্কার ত্যাগ কর। দেশকে উন্নতির পথে ঠেলিয়া তুলিতে হইলে—বীর সাহচর্য্যে আসিতে স্ত্রীলোকদের কোনদিন কোনও প্রকারে বাধা দিও না। ইহাতে অপমান নাই। ইহাই মনুষ্যত্ব। অনেক শিক্ষিত দেশের লোক স্বামি-স্ত্রীতে মিলিয়া শিকারে যায়, একসঙ্গে একই জীব একই লক্ষ্যে শিকার করে। তাহাতে কত আনন্দ, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে না। আমার কোনও কর্ম্মের উপর তোমরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিও না। তাহাতে কখনই কোনও সুফল হইবে না। তোমাদের ধারণার কোন মূল্য নাই। বিশেষতঃ, ভবিষ্যতের জন্য বলিতেছি, কখন কেহ আমার কার্য্যের উপর দৃষ্টি দিও না। যদি পার, আমার উপর নির্ভর করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিও।"

যাহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ রামদয়াল বসু মহাশয় বলিলেন— "নারীর মর্য্যাদা দিতে আমাদের দেশ—আমাদের শাস্ত্র বিশ্বের আদর্শ। হিন্দুর নিকটে পরস্ত্রী মাতৃস্থানীয়া। নারীমাত্রেই মাতৃশক্তিতে পূর্ণ। নারীমাত্রেই সেইজন্য আমাদের নিকট সর্ব্ব সময়ে পূজ্যা। শক্তির নিকট—এই প্রকৃতি শক্তির নিকট পুরুষ চিরদিন নতশিরে রহিয়াছে। এ তত্ত্ব, এ শিক্ষা আর কোন্ দেশে

আছে ? সনাতন শিক্ষার শেষ পরীক্ষাই বোধ হয় বিশ্বমাতা নারীর পূজা।"

দেববাবু এই প্রবীণ বৃদ্ধের কথায় জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বচনে বাঘ মারা যাইলে এতদিন ধরিয়া অকর্ম্মীর দল এই হিন্দু পৃথিবীর উপরে নিজেদের আধিপত্য প্রচার করিতে পারিত। কিন্তু তাহা পারিয়াছে কি ? কেন পারে নাই, তাহা তোমাদের জানা নাই। সেই ভুল সংশোধন করিতে হইলে, আমার আদর্শে নিজের স্ত্রী-কন্যা ভগিনীদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া —পাশ্চাত্য আদর্শে তাহাদের সর্ব্ব সমক্ষে বাহির হইবার অবাধ ক্ষমতা দাও। তাহারাও যে নিজেদের সামর্থ্যে নিজেদের ভরণ পোষণ করিতে পারে, তাহার আদর্শ আমাদের দেশের বাহিরে প্রত্যেক মহাদেশেই আছে। সেইভাবে তাহাদের মানুষ কর। অন্ধকারময় গৃহ-কক্ষটিই তাহাদের বাসস্থান নহে। আলোকের উন্মুক্ত ক্ষেত্রেও তাহাদের আসিবার ক্ষমতা আছে।"

অরণ্যে রোদন করিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া, ভদ্রমণ্ডলী উদ্ধত নবীন জমীদার মহাশয়ের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া জ্ঞানবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। জ্ঞানবাবু বলিলেন—"ও বাড়ীর সহিত পুরুষানুক্রমে আমাদের মনোমালিন্য। ইহার প্রতিকার আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে,—আমার কাছারীবাড়ীর পুষ্করিণীতে গ্রামের স্ত্রীলোক মাত্রেই আসিতে পারেন। সেখানে কাছারীর লোকজন আজ হইতে আর কেহ থাকিবে না। আপনারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে কাছারী বাড়ী রক্ষা করুন।" সকলেই তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে করিতে নিজ নিজ বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন দেববাবু সদলবলে শিকারে আসিয়া, নদীর ঘাটের উপরে নিজের তাম্বু বিস্তার করিয়া, বন্ধুদের প্রাতর্ভোজের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন। যাহাদের অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য তাঁহার উদ্যোগ, তাহাদের কাহাকেও সেদিন আর দেখিতে না পাইয়া, বিশেষ বিস্মিত হইয়া বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঘটনাচক্রে সেইদিন সদাশিববাবু ও মায়া নদীর বাঁধের উপর দিয়া টমটমে চড়িয়া নারায়ণপুর হইতে বাহির হইয়া বায়ুসেবনের জন্য এখান পর্য্যন্ত আসেন। এখান পর্য্যন্ত আসিবার উদ্দেশ্য —জ্ঞানবাবু প্রায়ই এই বাঁধের উপর বেড়াইতে আসেন। যদিই সাক্ষাৎ হয়। সাত-আনী হইতে নারায়ণপুরের ব্যবধান মাত্র দুই মাইল। ঘাটের উপর তাম্বু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন—দেববাবু বন্ধুবান্ধবের সহিত শিকারে আসিয়া এখানে তাম্বু ফেলিয়াছেন। সেইখান হইতে গাড়ী ফিরাইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু হঠাৎ একটা উচ্চ কোলাহলে গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপিয়া উঠায়, সদাশিববাবু ও মায়া কোনও প্রকারে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। এদিকে ঘোড়ার চীৎকারে ও সহিস কোচম্যানের কর্কশ আওয়াজে তাম্বু হইতে দুই এক জন লোক বাহিরে আসিয়া, বহু দর্শনীয় বস্তু অনেক থাকা সত্ত্বেও কিশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে অনিন্দ্য-সুন্দরী মায়াকে দেখিয়াই তাম্বুর মধ্যে এ সংবাদ দিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না। এ শুভ বার্ত্তা তাহাদের মধ্যে অতিরঞ্জিত হইয়াই প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দেববাবু বাহিরে আসিয়া সদাশিববাবুকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। নিকটে আসিয়া নমস্কার করিয়া

দাঁড়াইলেন। সময়োচিত আলাপের পরে মায়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এ মেয়েটিকে আমি ত কখনও দেখি নাই; এটি কি আপনারই কন্যা?"

অপরিচিত যুবককে সম্মুখে দেখিয়া মায়া পিতার হাত ধরিয়া কেমন যেন বিরক্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল,—"বাবা চলুন, এখানটা আমার কেমন বিশ্রী বোধ হচ্চে।"

৮

মহা সমারোহে মায়া তাহার মায়ের বাৎসরিক কার্য্য সমাধা করিল। এদিকে সাত-আনীতেও প্রণবকৃষ্ণ তাঁহার মায়ের বাৎসরিক কার্য্য করিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান সনাতন রায় সাত-আনীতে আসিয়া জ্ঞানবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া, বিবাহের দিনস্থির করিলেন, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই বিবাহ হইবে। সমস্ত কথাই স্থির হইয়া যাইবার পরও দেওয়ানজীকে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দুই দিন সাত-আনীতে থাকিতে হয়।

সাত-আনীর সঙ্গে নয়-আনীর চিরদিনের অসদ্ভাব। দেববাবু মায়ার অন্যত্র বিবাহের কথা স্থির হইয়াছে জানা সত্ত্বেও, মায়ার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। দেশময় প্রচার করিয়াছেন, জ্ঞানবাবুর ছেলের সঙ্গে এ বিবাহ হতেই পারে না। কারণ সদাশিববাবু নিখরচায় প্রণব অপেক্ষা ধনে, মানে, শিক্ষায় যোগ্য পাত্র পাইয়াছেন। এর মধ্যে একদিন একজন ঘটক গিয়া জ্ঞানবাবুকেও বলিয়া আসিয়াছেন যে, "সদাশিববাবু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে, একটু অন্তরালে আসিতে আজ্ঞা হয়।" তারপর ঘটক মহাশয়

বলেন, "সদাশিববাবুর একান্ত ইচ্ছা মায়ার বিবাহ অন্যত্র দেন।' কারণ প্রণবের এই শিক্ষার অবস্থায় এ বিবাহ কোনও প্রকারে সঙ্গত হ'বে বলে মনে হচ্ছে না। তখন মনের চাঞ্চল্যে বেশী না ভেবেই হঠাৎ একটা ছেলে-মানুষের মত যে কাজ ও কথা হয়ে গেছে তা' দয়া ক'রে ভুলে যান। তিনি নিজে বিশেষ লজ্জিত হয়েছেন বলে, আর আপনার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করতে সাহস কচ্ছেন না। দয়া করে আপনি একটু পত্রে আপনার সব বক্তব্য অবশ্য লিখে দিবেন, আমার এই অনুরোধ।" ঘটকচূড়ামণি জ্ঞানবাবুকে এ কথা বলিতে বিস্মৃত হন নাই যে, "এটা সদাশিববাবুর পক্ষে ভাল কথা হ'ল না। বাক্‌দানের পরে কথা ফেরান! আশ্চর্য্য কথা বাবু! একালে কতই না দেখতে হবে। কি করি বলুন বাবু, আমরা ত আপনাদের হুকুমের চাকর। যখন যেখানে যে কাজের জন্য পাঠান না কেন, আমরা ত কখন 'না' বল্‌তে পারি না। ত্রেতার রামরাজত্বের দুর্ম্মুখের কাজ এখন আমাদের কর্‌তে হচ্চে। আমাদের মান নেই, অপমান নেই—যে যা ব'ল্‌বেন তাই কর্ত্তে হ'বে।"

ইহাতে জ্ঞানবাবুও দুঃখের সহিত সেই ঘটকচূড়ামণিকে দিয়া বলিয়া পাঠান যে, ইহাতে আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। আমার আদৌ এ বিবাহে ইচ্ছা নেই। কেবল সনাতন দেওয়ান-জীর কথায় ভুলিয়া আমারও এ ভুল হইয়াছে। যাক্, ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্য। পত্রে এ কথা লিখিয়া দিবার জন্য অনেক প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়াও জ্ঞানবাবু পত্র লিখিতে সম্মত হন নাই। কোন প্রকারে বুঝাইতে না পারিয়া শেষে বলেন, "এক্ষেত্রে সমান ব্যবহারই উচিত ঘটক মহাশয়। হাজার হোক্, আবাল্যের বন্ধু

সদাশিব, সে যখন পত্র দেয় নাই, পত্র দিতে সঙ্কোচ বোধ করেছে, তখন আমি কোন মতেই পত্র দেব না। পত্র লেখা অপেক্ষা আমি বরং সাক্ষাতে সব কথা বলাই সঙ্গত বিবেচনা কচ্ছি। যাক্, আপনি এ শুভসংবাদের বাহক হ'য়ে এসেছেন, তার জন্য যৎসামান্য প্রণামী নিয়ে যান। তা হ'লেও সকলেই বুঝ্‌তে পারবেন—আমি ইহাতে বিশেষ সুখী।"

জ্ঞানবাবু এ ঘটকচূড়ামণিকে কোন দিনই বিশ্বাসের চক্ষে দেখেন নাই। কারণ, কত স্থান হইতে কত ডানা কাটা পরী আনিয়া প্রণবের সঙ্গে তিনি বিবাহ দিবেনই, এ কথা বহুদিন ধরিয়া কহিয়া আসিতেছেন। এই প্রকার ভরসা দিয়া অনেক পথের খরচও ইতোমধ্যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্ববরেণ্য পাত্রী উপস্থিত দৃষ্টি বহির্ভূতেই অবস্থান করিতেছেন। কোন্ দিন যে লোক চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন, তাহা বলিতে ঘটকচূড়ামণি এখন সম্মত নহেন।

দেওয়ানজী সাত-আনীতে আসিয়া এই সব ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া জ্ঞানবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অতি কূট বুদ্ধিতে দক্ষ বৃদ্ধ দেওয়ানজী আজ কাহার নিকট পরাস্ত হইতেছেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়াই দু'দিন কাল এখানে বসিয়া রহিলেন। দেওয়ানজী পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, জ্ঞানবাবু কথা দিয়া তাহার পরিবর্ত্তন কখন করেন নাই। ইহার মূল অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। যাক্, সময়ে সব বাহির হইবে। বৃদ্ধ দেওয়ান কর্ম্মচারীদের সহিত কথায় কথায় নয়-আনীর দেববাবুর সহিত প্রজাদের ব্যবহার ও কাছারী-বাড়ীর পুকুর গ্রামের লোকের জন্য দেওয়ার কথা শুনিতে পাইলেন। তখন আর বুঝিতে বাকি

রহিল না যে, এ বিঘ্নের উৎপত্তি কোথায়! দেওয়ানজী বলিলেন, "তবে ও পক্ষের সহিতই একটা দিন ধার্য্য করিয়া বিবাহের আয়োজন করা যাউক—আর এখানে থাকিয়া আমার কোনও লাভ নাই। নয়-আনীর বাড়ীতেই নূতন কুটুম্বের আদর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই।"

জ্ঞানবাবু বলিলেন, "সেই ভাল। তবে বলা বাহুল্য, আমার একমাত্র ভাবী পুত্রবধূ মায়ার সহিত অন্যত্র বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়া কেহ যেন আমার অপমান করিতে সাহস না করে। অপর কোন বংশ-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠা দরিদ্রা সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যার সহিত আপনার ঈপ্সিত নূতন কুটুম্বের সে বিবাহ হইবে। রূপে গুণে সে মায়ার মতই হউক, এই আমার প্রার্থনা! দেবনারায়ণ যতই উদ্ধত, অসংযমী হউক না কেন, তাহার ভবিষ্যৎ যাহাতে ভাল হয়, তাহার জন্য আমাদের চেষ্টা করিতেই হইবে। তাহার উপর অভিমান করিয়া, তাহার এই অভিভাবকহীন অবস্থায় প্রতিশোধ মানসে কোন প্রকারেই তাহার সহিত মন্দ ব্যবহার করিতে পারিব না। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে দেবনারায়ণ বংশের গ্লানির মত দেশময় যে সব অত্যাচার করিতেছে, তাহার জন্য আমরাও দায়ী। আমাদেরই বংশের সন্তান চিরদিন যে একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিতে পড়িয়া থাকিবে, ইহা আমার পক্ষে যত নিন্দার, অপরের পক্ষে ততটা নহে।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "আপনার শুভেচ্ছা কার্য্যে পরিণত হউক। তবে বোকাকে যত সহজে সুপথে আনা যায়, শয়তানকে তত সহজে সুপথে আনা যায় না। আর এটাও খুব সত্য যে, যে যত বড় শয়তান, তার তত বড় বুদ্ধিটি যদি একবার সুপথে অগ্রসর

হয়, তবে তার উন্নতি জন্মগত সুবোধ সুশিষ্ট হইতেও অধিক হইবে ইহা সুনিশ্চিত। ব্রাহ্মণের সন্তান চিরদিন ভোগের জন্য লালায়িত হইবে, ইহা কখনও সম্ভব নহে। একদিন না একদিন ব্রহ্মণ্যশক্তির তেজেই তাহার মতি-গতির পরিবর্ত্তন হইবে।”

দেওয়ানজীর প্রমুখাৎ সাত-আনীর এই সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া সদাশিববাবু কহিলেন, “আমি ত এ সব জানি না। কখনও এরূপ ভাবিও নাই যে, এত বড় চক্রান্ত করিয়া দেবনারায়ণ আমার অপমান করিবে। ধন্য তাহার সাহস! এখানেও ঘটক পাঠাইয়াছিল। ওঃ! এতবড় ধূর্ত্তামি এই অল্প বয়সে দেবনারায়ণের যে সম্ভব, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। তুমি সাত-আনী গেলে পর, ঘটক এখানে আসে এবং আমায় বলে ‘মায়ার সহিত দেববাবুর বিবাহের সম্বন্ধ করিতে তিনি এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। এ বিবাহে পাত্র পাত্রী উভয়েই সুখী হইবে। এমন কি সদাশিববাবুর আদেশ পাইলে বিবাহের পর নয়-আনীর সমস্তই তুলিয়া আনিয়া এ বাটীতে বাস করিতেও পারেন।’ এই সমস্ত শুনিয়াই আমি বলিয়াছিলাম—‘আমার কন্যার বিবাহ অন্যত্র স্থির হইয়া গিয়াছে। পরস্পরের বাগ্‌দানও হইয়া গিয়াছে, এখন মাত্র বিবাহের মন্ত্র কয়টি পড়িতে বাকি আছে। আমি বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, দেববাবুর মত শিক্ষিত যোগ্য পাত্রে কন্যা দান করিবার সুযোগ আমি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি’।”

দেওয়ানজী ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—“উত্তর ঠিক দেওয়া হয় নাই। রোগের উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগও হয় নাই। ইহাতেই শেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না। নয়-

আনীতেও একবার দেখা দিয়ে এসেছি। দেববাবু বলিলেন—'সেদিন নদীর বাঁধে মায়াকে দেখিয়াছিলাম, তখন হইতে আমার ইচ্ছা আপনাদের জামাই হই।' বেশ স্বচ্ছন্দচিত্তে একটা রূপ-মুগ্ধ উন্মত্ত যুবক আমাকে মাতৃরূপের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দিল। আমিও অবনত শিরে সে অপমানের বোঝা মাথায় বহিয়া নীরবে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। দোষ দিব কাহাকে? তাহাকে, না আমাদের এই সমাজকে? বোধ হয় তাহার উপরেও আর কাহাকেও দোষ দিলে দোষের হয় না। বাগ্‌দত্তা কন্যাকে যাহারা সাধারণ চক্ষের উপর সাহেবী কায়দায় গাড়ী জুড়ি চড়িয়া বায়ু-সেবনের জন্য ঘরের বাহির করে, তাহাদের এখন শত অপমান সহ্য করিতে হইবে। এ অপমান সহ্য করিবার শক্তি না থাকিলে, এই পল্লীগ্রামে চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কন্যাকে লইয়া কে কবে এমন ভাবে সাহেবীয়ানা করিয়াছে? যাহারা দেশের প্রথার উপর, দেশের আচারের উপর নিজের স্বেচ্ছাচার আনিতে সাহস পায়, তাহাদের উপর সাধারণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্রূপের আকারে পড়িবেই। এই যে এক উদ্ধত যুবক, কুমারী কন্যাকে কুৎসিত দৃষ্টিতে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হইয়াছে—হিতাহিত-বোধশূন্য হইয়াছে—তাহাতে তাহার ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা ও যৌবনই দোষী বটে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সব উদ্ধত প্রকৃতির সম্মুখে যাহারা প্রলোভন ধরিয়াছে, তাহাদের পাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উভয়েই বাধ্য।"

অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইবে। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে তাহার আয়োজন চলিতে লাগিল। আশ্বিন কার্ত্তিক দু'মাস পূজার ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হয়। কাজেই যতটা

যে কার্য্য করিয়া রাখা সম্ভব, তাহার জন্য বৃদ্ধ দেওয়ানজী একবার সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। এতদিন থাকিতে বিবাহের উদ্‌যোগ পর্ব্ব দেখিয়া সদাশিববাবু বলিলেন, "দেখো দাদা, শেষে যেন বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া না হ'য়ে পড়ে।"

"না, সে ভয় নেই। তবে কথা হচ্ছে, দুটো বিয়ের আয়োজন করা হবে কি না। তাই যা একটু সময় অল্প হ'য়ে যাচ্ছে।"

"দুটো বিয়ে! সময় অল্প! মানে!"

"সব কথার মানে কি কাজে পরিণত না ক'রে করতে পারা যায়? এটা এখন বলা হতেই পারে না। সময়ে কার্য্য শেষ হ'লে অর্থ নিজেই সামনে এসে দাঁড়াবে।"

সদাশিববাবু জানিতেন, আর জিজ্ঞাসা করা বৃথা। শত অনুরোধে উপরোধে আর সনাতন রায়কে গলাইতে পারা যাইবে না। এটাও তিনি জানিতেন যে, যাহা অসম্ভব তাহাতে সনাতন রায় কখনও হাত দেন না। সাধারণে সনাতন রায়ের প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যেই একটা নূতন কিছু অদ্ভুত দেখিতে পাইতেন। যাহা কেহ কখনও বড় একটা করে নাই, সনাতন রায় তাহাই বিপুল উদ্যমে করিবেন। অথচ তাঁহার দোষ কেহ কখনও বাহির করিতে পারেন নাই। এইরূপ স্বভাব ও প্রকৃতি লইয়া সনাতন রায় এই পরিবারের মধ্যে নিজের অসাধারণ কৃতিত্বকে সম্মানের আসনে বসাইয়া আজীবন অতিবাহিত করিতেছেন। আর অল্প যে কয়দিন বাকি আছে, তাহার মধ্যে কে উপরোধ, অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হইবে! তাই সদাশিববাবু নিজের দিকে চাহিয়া যেন একটু 'কিন্তু' হইয়াই নীরবে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"এ.

বৃদ্ধ করে কি ? বলে কি ? মায়ার ত বিবাহ হইবেই এ কথা স্থির ; তবে আর কার বিবাহ দিবার ইচ্ছা মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়া, এত বড় উদ্‌যোগ পর্ব্বের সূচনা করিতেছেন ! এ বিপদের মধ্যে আবার আমাকে জড়াইতে সাহস করিবে না কি ? এ ধারণা যদি তাহার মধ্যে অণু পরিমাণেও স্থান পাইয়া থাকে, তবে বৃদ্ধের চিরজীবনের কর্ম্মের উপর ভুল একটা কলঙ্ক-রেখাপাত করিবে। এত বড় ভুল করিবে কি ? না, এ চিন্তা যে আমারই হৃদয়ের পরীক্ষা করিতেছে। আহা ! সেই মুখ—যাহা আমার সাধনার ধনের মত—আমার জীবনে পূর্ণ শান্তি দিয়া আমার নিকট অমরত্ব লাভ করিয়া রহিয়াছে, তাহা কি কখনও ইহ-পরজীবনেও ভুলিয়া যাইতে পারি ? কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আবার আমাদের চির-মিলনের দিন আসিবে, তাহাই আমার একমাত্র ধ্যানের বিষয়। ওগো, তোমরা বলিয়া দাও, আরও কতদিন আমায় এ ধ্যানের সমাধির অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে।”

৯

অনেক সময় আমরা বিবেচনা করিয়া যাহা করিতে যাই, তাহাই যেন ঠিক আমাদের উপযোগী না হইয়া বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। নিজেদের সুবিধার জন্য যে কর্ম্ম, যে সময়ে, যেমন করিয়া সমাধান করিতে পারিলে আমাদের যশ, মান, কীর্ত্তি—মোটের উপর আত্মগৌরব লোকচক্ষুর সম্মুখে অধিকতর ভাবে পরিস্ফুট হইবে, তাহাই করিতে প্রাণপণ করিয়া থাকি। কিন্তু কর্ম্মশক্তি কাহার প্ররোচিত হইয়া কখন অন্যদিকে চলিয়া যায়, তাহা বুঝিতে

পারি না। আমাদের কর্ম্মে অধিকার আছে—কর্ম্মফলে অধিকার নাই। ভগবানও তাহাই বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥"

কর্ম্মের সূচনায় সঙ্কল্পের সহিত ফল কামনা থাকিলেও, আমাদের কর্ম্মফল ভগবৎ ইচ্ছায় ভগবানেই সমর্পিত হয়। ফলাফলে অনাসক্ত না হইলে বুঝি কর্ম্মে অধিকার আসে না। ভগবৎ-প্রীতিতেই আমাদের সনাতন কর্ম্মের আমরা অনুষ্ঠান করি। কিন্তু আমরা শিক্ষার গুণে এখন এমনই হইয়া পড়িয়াছি যে, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল আমাদিগকে আয়ত্ত করিয়াছে—আমরা কর্ম্ম ও কর্ম্মফল আয়ত্ত করিয়া 'ইদং কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' বলিবার শক্তি হারাইয়া বসিয়াছি। নিজেদের গর্ব্বে যতই গর্ব্বিত হইয়া তাহাদের আয়ত্ত করিতে যাই, ততই যেন তাহারা আসক্তির বর্ম্মে নিজেকে আবৃত করিয়া আমাদের উপহাস করে। এই ভুলের নীতিতে পড়িয়াই আমরা কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেছি। কর্ম্ম-বৈফল্যে কর্ম্মশূন্য হইয়া পড়াই আমাদের শিক্ষার সার নহে। কর্ম্ম অনাদি অনায়ত্ত। কয়জন এ কথা বুঝিয়া কাজ করিতে পারি!

দেওয়ানজীর ইচ্ছা অগ্রহায়ণ মাসেই মায়ার ও প্রণবের বিবাহ হয়, সদাশিববাবু ও জ্ঞানবাবুর ইচ্ছাও তাই অগ্রহায়ণেই মায়ার ও প্রণবের বিবাহ হয়। কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা কাহার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন, তাহা পড়িবার সুযোগ এ মরজগতে কাহারও ভাগ্যে ঘটে না বলিয়াই যত বিড়ম্বনা। এই জীবন-নাট্যের অভিনয়

করিতে বাধ্য জীব কতই না কর্ম্ম-বিপত্তিতে পড়িয়া গুটিপোকার মত নিজের কর্ম্মপাশে নিজেই আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। ভগবৎ-নীতিতে কর্ম্মের কৌশল আয়ত্ত করিতে যদি সমগ্র বিশ্ব পারিত, তাহা হইলে এতদিনে কর্ম্মের সমাধি হইয়া যাইত। তাহা হয় কই? হয় না বলিয়াই ত যত কিছু বিপত্তি। এই কর্ম্ম-বিপত্তি আমাদের আয়ত্ত করিয়া বিদ্রোহীর মত কার্য্য করাইতেছে। আমরা তাহারই কামনা বাসনার মধ্যে প্রবুদ্ধ হইয়া আমাদের ভূতাতীত- নিরঞ্জন বিরাট পুরুষকে - পরমানন্দের রাজরাজেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছি। আবার কতদিনে সে সুদিন আসিবে, যে দিন আমাদের কর্ম্ম-কৌশল আমাদের নিদান অবস্থা দেখিয়া, প্রাণের আবেগে নিজের পথে চলিয়া আনন্দিত হইবে—আনন্দ পাইবে। কর্ম্মজয়ী দেবতার প্রসাদে কর্ম্মের বন্ধন স্বতঃই মুক্ত হইয়া জীবনের সাফল্য আনিয়া দিবেনই। এ বিশ্বাস যেন আমরা কোন দিনই না হারাই।

বৃদ্ধ দেওয়ানজীর চিরজীবনের কর্ম্মের একটি মহা পরীক্ষার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। কোনও দিন তাঁহাকে নিজের আরব্ধ কর্ম্ম শেষ করিতে এত বেগ পাইতে হয় নাই। কুটিলতা অবলম্বন করিয়া কখনও কোন কাজে হাত দেন নাই। কিন্তু এই শেষ দশায় জীবন মরণের সন্ধিস্থলে বুঝি বা সে সুনাম ও সে অধ্যবসায় সব বিসর্জ্জন দিতে হয়। নিয়তিদেবী এমনই সমস্যায় ফেলিয়া বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে পরিহাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন রাত্রে দামোদর নিজের দামোদর বিস্তার করিয়া একটি খণ্ড-প্রলয়ের সৃষ্টি করিলেন। নিজের ক্ষমতায় কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই যেন একবার চিরদিনের

নিজের গণ্ডী—কূল ছাপাইয়া, দুই পার্শ্বে যোজন পরিমাণ ভূমির উপর প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিতে বাহির হইলেন। নিজের জন্মস্থান রামগড় পাহাড় হইতে বন্যারূপ বাহনে আরোহণ করিয়া পথিমধ্যে ঝড় ও বৃষ্টি সেনাপতিদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, এমন এক দিগ্বিজয় করিতে সূত্রপাত করিলেন যে, তাহাতে বিজিতদেশে এমন কেহ রহিল না, যাহারা তাঁহার এই অমিত শক্তির প্রাপ্য মর্য্যাদা দিবেন—বা তাঁহাকে জয়মাল্য দিয়া বরণ করিয়া রাজাধিরাজের সম্মানে ভূষিত করিবেন। বিশ্বশত্রুর সঙ্গে তাঁর চির-সখ্যতা আছেই, এ ধারণা তাঁর তীরে বাস করিলেই উপলব্ধি করিতে বাধ্য। বিজ্ঞান ও অর্থশক্তির বলে প্রবল-প্রতাপান্বিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এই বাধ্যতার উপরও দামোদরের অত্যাচার হইতে রেল বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য একটি কাটাখালের সৃষ্টি করিয়া তাহারই পাশে দামোদরের তীরে-তীরে এমন এক সুদীর্ঘ বাঁধের সৃষ্টি করিলেন যে, তাহাতে তাঁর বাম তীর-বাহু একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। সেই রাগ মিটাইয়া লইবার জন্য নিজের দক্ষিণ বাহু এমনভাবে প্রতি বর্ষার দিন বাড়াইতেছিলেন যে, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত পর্য্যন্ত এই তীরবাসীকে এই সব ঋতুর কোন শস্যই গ্রহণ করিতে না দিয়া—নিজের দামোদরের তৃপ্তি করিতেন। কিন্তু এবারে এই দুই সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে আনিয়া এতদিনের গায়ের ঝাল মিটাইয়া লইবার জন্য মধ্যে মধ্যে বাঁধের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিয়া পুরাতন হৃত রাজ্যের সৌন্দর্য্যরাশি একেবারে নিজের বিরাট উদরে প্রবেশ করাইতে কণামাত্র করুণা প্রকাশ করিলেন না। পঞ্চাশ বৎসরের পর এই ভূরি ভোজনে বুঝি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন—তাই দামোদর নিজের বিরাট দেহ বিস্তার করিয়া

তীরের উভয়দিকে চারিক্রোশ স্থানে ৩৬ ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম সুখ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁর সেই সুখনিদ্রার সময়ে চারি শত গ্রামবাসীকে একেবারে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইতে হয়। এই বিরাট অতিথির বিরাট উদর-গহ্বর পূর্ণ করিতে চির-দিনের বাস্তু, পৈতৃক ধন-দৌলত—স্ত্রী-পুত্রসহ কত সংসার আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। তবে না কি বাঙ্গালী তেমন অতিথি-সৎকার জানে না, তাই যথাসর্ব্বস্ব দিয়া স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া কোনমতে বৃক্ষে—উচ্চস্থানে কোথাও বা কটি নিমজ্জিত জলে তিনদিন পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিয়া কোন রকমে প্রাণ বাচাইয়াছিল।

নারায়ণপুরের দশা এখন কি হইয়াছে দেখুন—মাত্র জমীদার সদাশিববাবুর প্রাসাদতুল্য আবাস ভবনের দ্বিতলে ৮।১০খানি ঘর আছে। একতলার ঘর একেবারে জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর গ্রামের কোনও কিছুই নাই। কেবল চারিদিকে জলরাশি মরুর মত ধূ ধূ করিতেছে। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে—কেবল জল—জল—আর কিছুই নাই। দুই ক্রোশের মধ্যে ২।৫টি অতি বৃহৎ বৃহৎ বট, অশ্বথ প্রভৃতি বৃক্ষ নিজেদের কাণ্ডদেহ নিমজ্জিত করিয়া যেন কোন্ যুগ হইতে সমাধিতে বসিয়াছে!

বন্যার রাত্রে সদাশিববাবু ও দেওয়ানজী লোকজন সঙ্গে লইয়া দু'খানি বাচ্ খেলার ছোট নৌকা করিয়া বিপন্ন গ্রামবাসীদের বহিয়া বহিয়া নিজের বাড়ীতে আনিতেছিলেন। রাত্রি ১টার পর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া যত লোকের সন্ধান পাইলেন—প্রায় গ্রামের সকলকে আনিয়া, বাড়ীর দ্বিতলে ও ছাদে কোনও প্রকারে বসাইয়া দেওয়ানজীর উপর তাহাদের

ভার দিয়া একবার শেষ খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন—যদি আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল, সদাশিববাবু আর ফিরিয়া আসেন না দেখিয়া সূর্য্যোদয়ের পর দেওয়ানজী নিজে ও আরও দুই চারি জন লোক আপন নৌকায় উঠিয়া সদাশিববাবুর সন্ধান লইবার জন্য বাহির হইলেন। আর দ্বিতীয় যান নাই যাহার সাহায্যে আরও কেহ সন্ধান করিতে যাইতে পারে।

সদাশিববাবু অতি বাল্যকালে এই জলযান দুইখানি নারায়ণপুরে শিবসায়রে ভাসাইয়া বাচ্ খেলা করিতেন। এখনও বৎসরের মধ্যে দশহরার দিনে নৌকাদ্বয় নব-কলেবরে শোভিত হইয়া স্কুলের ছেলেদের বাচ্ খেলায় ব্যবহৃত হয়। গ্রামের মধ্যে—গ্রামের মধ্যে কেন চতুষ্পার্শ্বের দশখানি গ্রামের কোথাও জলযান নাই, যাহাতে এই বিপদের দিনে কোনও প্রকারে কাহারও সাহায্য হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ দেওয়ানজী বেলা ১০টা পর্য্যন্ত সেই প্রকার তুফানের মধ্যে কোথাও সদাশিববাবুকে দেখিতে না পাইয়া, নিরাশ হইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিবার পথে দেখিলেন, একটি বট বৃক্ষের ডালে সদাশিববাবু যে নৌকায় বাহির হইয়াছিলেন, সেই নৌকাখানি বাঁধা রহিয়াছে, তাহা জন-শূন্য। নিজের নৌকার সঙ্গে সেখানিকে বাঁধিয়া লইয়া, বাহিরের বন্যার তুফানের ন্যায়ই মনের মধ্যে তুফান তুলিয়া, যৌবনের শক্তিকে স্মরণ করিয়া একাই দুইখানি নৌকা ধীরে ধীরে বাহিয়া বাড়ীর প্রান্তে আসিয়া শুনিলেন—মায়া ছাদের উপর হইতে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"জেঠা মশায়, বাবা—বাবা কোথায় গেলেন ?"

দেওয়ানজী বাড়ীতে উঠিয়া মায়াকে বলিলেন,—"বাবু বোধ হয় আর কাহারও নৌকায় অন্যত্র গিয়াছেন। ভাবনার কারণ কি ? সঙ্গে ত একজন লোক রহিয়াছে। তা ছাড়া আমার সঙ্গে যারা ছিল, তাদের সব বাবুর সন্ধানে পাঠিয়েছি।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল,—"জেঠা মশায়, কিসে তারা সব গেল ? বানের জল যে সর্ব্বত্রই যায় নাই তারই বা ঠিক কি ?"

"সাত-আনীর দিকে তাদের পাঠিয়েছি, সেখানে বানের জল কম হওয়াই সম্ভব। এখান হ'তে সাত-আনী পাঁচ-ছ হাত উঁচুতে। অনেকগুলি কপাট ও কাঠ বানের জলে ধ'রে একসঙ্গে বেঁধে তাতেই কোন রকমে নির্ভর ক'রে, তাদের সাত-আনীতে পাঠিয়েছি। বাবুও বোধ হয়, এই সব লোকের ব্যবস্থার জন্যে, সেদিকেই গেছেন। বাবুর নৌকায় ভৈরবও ছিল সেও গিয়াছে। সে সঙ্গে থাকায় আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত। তা মা এখন বাবুর ভাবনা না ভেবে এই তিন চারশো লোকের আজকের খাবার ব্যবস্থা কি কর্‌ছ ? তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে তোমার সব ছেলেরা কি উপোস দেবে ?"

"একবার দেখুন দেখি জেঠা মশায়, কোথায় কি করা যায়! ঘর, ছাদ লোকে পরিপূর্ণ, তার উপর এই বৃষ্টি। খাবার জিনিস কোথায় বা কি আছে ? বানের প্রথমে এ সব কথা ত মনে হয় নাই। নীচের ভাঁড়ার ঘর জলে পরিপূর্ণ, আর এক ধাপ হইলেই উপরে জল আসে। তখন দলিলপত্র নিয়েই আপনার সঙ্গে ওপরে জোড়া ছিলুম। কি হবে জেঠা মশায় ?"

"কি হবে বল্লে হ'বে না মা! এ বাড়ী হ'তে তোমার বাপ ঠাকুরদাদার আমলে কখনও কেহ অভুক্ত ফেরে নাই। আজ

তুমি অন্নপূর্ণা হ'য়ে অন্ন দিতে কাতর কেন মা? লক্ষীর ভাণ্ডার কখনও কি শূন্য হয় মা! সবই আছে, তোমার এই বুড়ো ছেলের পেটের চিন্তা সব চিন্তার বড়। সব খেয়েও এ পেট পোরে নি। তাই, সব কাজের আগে পেটের যোগাড় ক'রে রেখেছে। তোমার সঙ্গে আর দু'চার জনকে নিয়ে আমার সঙ্গে এস ত মা। আমি সব দেখিয়ে দিই, কোথায় কি আছে, কোথায় কি হ'বে।" এই বলিয়া দেওয়ানজী মায়াকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের বাহিরে যাইবার বারান্দার চাবি খুলিয়া দেখাইতে লাগিল—"এই দেখ মা চালের বস্তা, এই দেখ মা ডালের বস্তা—এই দেখ মা ঘিয়ের টিন্—এই দেখ মা শুক্‌নো কাঠ—আর এই কাঠের গাদার ও-পাশে তেল নুন মশলা পাতি, রাঁধবার হাঁড়ি-কুড়ি থেকে যা যা দরকার সবই পাবে। তবে ছেলেদের দুধের কি হয় মা? মায়েদের দুধে কতক্ষণই বা তাদের ক্ষিদে মিটবে! একটু জলখাবার করেছিলে মা?"

"বড় জেঠা মশায় কাল যে সব মিষ্টি পা.ঁয়ে দিয়েছিলেন—সে সব ঠাকুরের ঘরে ছিল। ঠাকুরের পূজার পরই সেই সব প্রসাদে এদের একটু ক'রে জল খাওয়া হয়েছে। ছোট ছেলেদের বানের জল খেতে দিইনি, ঘরের জলেই তখন কুলিয়ে গেছে। আর একটুও খাবার জল তাদের দিবার মত নেই।"

"সমুদ্রে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ জলের তৃষ্ণা। আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি কচ্ছি, তুমি এদিকের ব্যবস্থা কর মা। আরও সব সঙ্গে লও। গিন্নীদের সব দেখিয়ে দিতে বল—তুমি, তোমার সঙ্গে আর যাকে যাকে ইচ্ছে সকলকে নিয়ে—তৎপর ক'রে রান্নার যোগাড় কর। তোমাদেরই সব করা চাই মা! আর.

বিধবাদের জন্য দিনে দিনেই সব যাতে হ'য়ে যায় তারও ব্যবস্থা তাঁদের ক'রে নিতে বল মা। যাও, আর দেরি ক'র না। আমি আর একবার বেরুবো। দেখি, যদি কেউ আর একখানি নৌকা নিয়ে কোথাও কিছু যোগাড় ক'রে আন্‌তে পারে। যা চাল ডাল আছে, এতে ত আর তিনদিনের বেশী চল্‌বে না। ঘর-বাড়ী না হওয়া পর্য্যন্ত কে কোথায় যাবে? কি যে হবে মা! লীলাময়, তোমার বিচিত্র লীলা বুঝিবে কে? মধুসূদন! এ বিপদে আমাদের ধৈর্য্য দাও, শক্তি দাও, সামর্থ্য দাও।" এই বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে ভাসাইতে সেথান হইতে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতলের সব ঘরে স্ত্রীলোক ও ছাদে পুরুষরা আশ্রয় লইয়াছিল। দেওয়ানজী ছাদে আসিয়া ২।৪ জন প্রবীণ লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা উচিত।" তাঁহাদের পরামর্শে দেওয়ানজী তাঁহার অনুগত দুইজন যুবককে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই বিপদের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে হবে,—তোমাদের উপর আজ যে ভার দিচ্ছি, তা উদ্ধার কর ত ভাই। তোমাদের দু'জনকে একখানা নৌকা নিয়ে বর্দ্ধমান যেতে হবে। সেখানে গিয়ে—কলিকাতার এই ঠিকানায় 'তার' কর যে, 'হাজার মণ চাল ও পাঁচ শত মণ ডাল—একশ' মণ আলু, দশ গাঁট কাপড় নিয়ে দুইদিনের মধ্যে যেমন ক'রে হোক্ বর্দ্ধমানে হাজির হ'তে হবে।' বর্দ্ধমানে আমাদের উকিলের কাছে পত্র দিচ্ছি। তিনি পত্র পেলেই টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। কাপড়ের কানাৎ—তাঁবু যত যোগাড় ক'রে আনা সম্ভব, তাও 'তার' কর্ত্তে ভুল না। এই চব্বিশ মাইল পথের পাথেয় তোমাদের জন্য মাত্র একপো গুড় আর আধ সের চাল দিতে পার্‌বো, এর বেশী দিতে হ'লে হয় ত

আর একজনের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে দিতে হবে। আজ আর ফির্‌তে চেষ্টা করো না। কাল বেলা ১০টার মধ্যে তোমাদের এখানে আসা চাই। তোমাদের না দেখে আমি একবিন্দু জল মুখে দেব না। দেখ, যেন আশী বছরের বুড়ো বামুনের প্রাণটা তোমাদের জন্যই বা'র না হয়।"

দেওয়ানজী প্রদত্ত দুইখানি পত্র ও সেই অপূর্ব্ব উপহার গুড় চা'ল সঙ্গে লইয়া, কমলাকান্ত দত্ত ও রাধাশ্যাম বসু স্বচ্ছন্দে দেওয়ানজীকে প্রণাম করিয়া, তখনই নৌকায় আরোহণ করিয়া নৌকাখানি একবার পরীক্ষা করিল। তাহারা উভয়ে উদ্দেশে গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিয়া স্রোতের মুখে নৌকা ভাসাইয়া দিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেওয়ানজী তাহাদের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অদৃশ্য হইলে বলিয়া উঠিলেন, —"ভগবান্, যাহাদের হৃদয়ে এত সাহস—যাহারা পরের জন্য এখন হইতে জীবন দিতে উদ্যত, তাহাদের যেন কখনও কোনও বিপদ না হয়, তাহাদের প্রত্যেক কর্ম্ম যেন দশের আদর্শ হয়—তাহাদের কোন কর্ম্মই যেন কখন বিফল না হয়।"

কমলাকান্ত ও রাধাশ্যামের দেখাদেখি আরও দুই চারিজন আসিয়া দেওয়ানজীর নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করিল। দেওয়ানজী আরও দুইজনকে আর একখানি নৌকা লইয়া, কলাগাছ কাটিয়া ভেলা বাঁধিয়া আনিবার ভার দিলেন—এবং বলিয়া দিলেন, যেন প্রত্যেক ভেলাই তিনজন লোকের ভার বহন করিতে পারে। একঘণ্টার মধ্যে তাহারা দুইটি ভেলা লইয়া ফিরিয়া আসিল। দেওয়ান সেনাপতির কি গুণে জানি না, অনেকেই এই বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার সৈনিকের দলে নিযুক্ত

হইতে চারিদিকে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ানজীও আনন্দে অধীর হইয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া এক এক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এক ভেলার সাহায্যে ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে কুড়িটি ভেলা প্রস্তুত হইয়া আসিল। নৌকা লইয়া দুইজনকে দুধের জন্য সাত-আনী পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে মায়া ও তাহার সমবয়সীরা খেচরান্ন প্রস্তুত করিয়া সকলকে আহারের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল। বালক-বৃদ্ধদের প্রথম অধিকার, তাহারাও এক্ষেত্রে বঞ্চিত হইল না। প্রথম প্রেরিত লোকদের মধ্যে একজন এই সময় সাত-আনী হইতে সংবাদ লইয়া আসিয়া জানাইল—"সদাশিববাবু সাত-আনীতেই আছেন। শরীরটা খারাপ হয়েছে ব'লে তাঁকে সেখানেই রেখে আসা হয়েছে। জ্ঞানানন্দবাবুও ছাড়িলেন না। ভৈরবও বাবুর নিকট আছে। ছোট ছোট ছেলেদের জন্য নৌকায় দুধ নিয়ে পেছুতে অন্য লোক আসছে। সাত-আনীর অবস্থা এতটা শোচনীয় নয়। তবে গ্রামের ছয় আনা রকম নষ্ট হইয়া গিয়াছে—দশ আনার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই।"

১১

ধ্বংসের পর প্রকৃতি যেন নূতন করিয়া আপন সৃষ্টি বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নূতন বেশে—সারা বিশ্বের উপর আপনার মোহিনী মূর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। চারিদিকের ধ্বংসের লীলা-চিহ্ন তখনও মুছিয়া যায় নাই। তাহারই মধ্যে আবার নূতনের উৎপাদন না হইলে এ বিশ্ব যে একেবারে যায়। তাই প্রকৃতির চিরনিয়মে ধ্বংসই সৃষ্টির রূপান্তর—আর সৃষ্টিই ধ্বংসের

অপরাশক্তি। যাহা কিছু ধ্বংস হইবে, তাহাতে সৃষ্টির বীজ থাকিবেই, নতুবা স্থিতির—এই বর্ত্তমানের চিহ্ন থাকে কোথায়! সৃষ্টির ও ধ্বংসের মধ্যেই স্থিতির জন্ম। এ সমবায় সম্বন্ধেই ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত। কাহাকেও ত্যাগ করিবার উপায় কাহারও নাই। তাই প্রকৃতি নিজ প্রকৃতিতেই বুঝি বাধ্য হইয়া আবার নূতন করিয়া দিগ্‌দিগন্তকে পূর্ণরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য, বসুন্ধরার বক্ষে শস্যশ্যামলা রূপের ছটায় নিজের আসন বিস্তার করিয়াছেন।

প্রভাত-সূর্য্য এই কয়দিন মেঘে ঢাকা থাকিয়া কিছুমাত্রও মলিন হন নাই—কিরণ শক্তিতেও হ্রাস পান নাই, তাহাই যেন প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, প্রথম উদয়েই নিজের পরীক্ষা এ জড়-জগতের সাক্ষাতে দিতেছেন। আর শস্যশ্যামলা সুজলা-সুফলা বঙ্গের রাঢ় বন্যার প্রকোপে পড়িয়াও যে নিজের যথাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই, তাহাই দেখাইতে যেন নব-কলেবর লইয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ সবুজ ধরিত্রীর বুকে বাতাসের সঙ্গে হেলিয়া-ঢলিয়া কথা কহিয়া প্রথম পদক্ষেপ করিতেছেন। চারিদিকের বন্যার জল কমিয়া গিয়াছে। কোথাও-কোথাও বালুকারাশির উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া একটি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত দেখাইতেছে—আবার কোথাও বা প্রকৃতির এই বিপর্য্যয় চিহ্নরাশি কোন একটি অতি বৃহৎ অথচ অতি প্রাচীন বটবৃক্ষের কাণ্ডে ও শাখায় আবদ্ধ হইয়া বলিতেছে, তোমার এই সুদীর্ঘ জীবনে কখনও আমরা তোমার আতিথ্যলাভ করিতে পারি নাই। যদি কালের গতির সঙ্গে স্রোতোমুখে পড়িয়া এই তীর্থে আসিয়া পড়িয়াছি, তবে আর কেন গৃহবাসী হই, আর যে ক'দিন আমাদের জীবন আছে সে কয়দিন-এইখানেই কাটাইয়া দিই।

প্রকৃতির এই জন্ম-মৃত্যুর কোন দিকেই লক্ষ্য না করিয়া একটি যুবক এক দ্রুতগামী অশ্বের পৃষ্ঠে বসিয়া চলিয়াছে। তীরবেগে ঘোটকরাজ ছুটিতেছে, তবুও যেন আরোহী তাহাতে সন্তুষ্ট নয়; যেন তার মনের বেগের সঙ্গে চলিতে পারিলে তবে ঠিক চলা হয়। এমনি মনে করিয়া পুনঃপুনঃ কশাঘাতে অশ্বরাজকে আরও বেগে চলিতে ইঙ্গিত করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নিজের কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার গন্তব্য স্থান আরও কত দূরে! ক্রমাগত তিনঘণ্টাকাল একভাবে অশ্ববরকে চালাইয়া বর্দ্ধমানের পারঘাটার কাছে আসিয়া. দামোদরের তীরে ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া, তার পর ঘোটক-রাজের মুখটি দুই হাতে ধরিয়া আদর করিয়া বলিতে লাগিল—"মলয়, তোমায় আজ বড় নিষ্ঠুর চক্ষেই দেখেছি—বড় নিষ্ঠুর শাসনেই অতি দ্রুত চালিয়েছি—কেন, তা কি জান বন্ধু! আজ আমার হাতে, আর তোমার শক্তিতে হাজার-হাজার লোকের ভার পড়েছে।" পারঘাটার নৌকায় মলয়কে লইয়া যুবক দামোদর পার হইয়া আবার তেমনি ক্ষিপ্রগতিতে চলিতে লাগিল। বর্দ্ধমানের আদালত-সীমানার মধ্যে আসিয়া দেখিল, সেদিন আদালত জনশূন্য অবস্থায় বিবাদকারিগণের জন্য বিষাদমগ্ন হইয়া বিরহীর ন্যায় হা-হুতাশ করিতেছে। বিশেষ চেষ্টায় জানিতে পারিল, বন্যার পর হইতে এই সাত দিনই প্রায় আদালতের অবস্থা এইরূপই। মাত্র বিচারপতিগণ ও কর্ম্মচারীরা আসিয়া ভূমিশূন্য রাজার রাজকার্য্যের মত জনশূন্য গৃহে বিচারপ্রার্থী-শূন্য বিচারে ব্যাপৃত থাকিয়া নানা গবেষণা করিতেন। আজ জন্মাষ্টমীর অবকাশ বলিয়া কেহই আসেন নাই। বিশেষ ক্ষুণ্ণ

হইয়া আবার সেই যুবা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বাঙ্গালায় আসিয়া অতি ধীরে-ধীরে প্রবেশ করিল। নিজের নামের কার্ডখানির উপর "বন্যার স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায় হইতে" এই কয়টি কথা লিখিয়া দিয়া একজন চাপরাশীর নিকট দিয়া বলিল—এইখানি এখন সাহেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে সে বিশেষ পুরস্কৃত হইবে। আর্দালীপ্রবর নতশিরে তাহাকে সম্মান জানাইয়া কার্ডখানি লইয়া ভিতরে গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সাহেব আপনাকে ভিতরে যাইতে বলিলেন।"

সদাশয় উদারহৃদয় H. D. Ware বন্যার দুর্দ্দিনের সময়ে বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। চিরপ্রফুল্লতার সদানন্দ যেন তাঁহাকে সব সময়েই ঘেরিয়া থাকিত। যুবাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সাহেব উঠিয়া গিয়া সম্ভ্রমের সহিত তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া বিনয়কণ্ঠে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বলিতে লাগিলেন, "আপনার 'দর্শনী-পত্র' বাঙ্গালায় লেখা আছে প্রণবকৃষ্ণবাবু! সেইজন্য আমি আপনাদেরই বাঙ্গালার আদব কায়দায় আপনার সম্মান করিতেছি। আসুন—বসুন, এই কেদারায় উপবেশন করুন—আমার অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন। প্রণবকৃষ্ণবাবু, সঙ্কোচবোধ করিবেন না—আমার বাড়ীতে এখন আপনি আমার অতিথি। আপনার মর্য্যাদা কি তাহা জানি না—তবুও সে অজ্ঞাত মর্য্যাদাকে সামান্য আকারে দেখা কোন প্রকারেই উচিত নয়। আপনি সুস্থ হন—শ্রান্তি অপনোদন করুন, পরে আপনার বক্তব্য শুনিতেছি।"

পূর্ব্বে দু'একবার কার্য্যসূত্রে প্রণবকৃষ্ণ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সম্মুখে আসিয়াছিল মাত্র—কিন্তু বিশেষভাবে কোন কিছু কথা

হয় নাই। তখন আদালত গৃহের কর্ম্ম-গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় ত অন্য ধারণা ছিল—তাই যেন কিছু বিস্মিত হইয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "ইনিই কি আমাদের দেশের একমাত্র বিচারকর্ত্তা। এমন প্রাণখোলা সরল ব্যবহার—এমনই সদানন্দ—"

"প্রণবকৃষ্ণবাবু, ক্রিয়ারহিত প্রত্যেক পদবিন্যাসেই যদি আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতে হয়, আমি তাহাতেও সক্ষম। কিন্তু কেবলমাত্র আপনার দেশের প্রকারভেদ অদ্ভুত চলন কথায় আমার স্থূল মস্তিষ্ক অনভ্যস্ত। প্রত্যেক মহকুমাই এ বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন রীতিনীতিতে ও পদবিন্যাসে অভ্যস্ত। তদ্ধেতু আমার বঙ্গ-ভাষা শিক্ষার প্রবল বাসনা অধ্যবসায়-শূন্যতা দোষে দূষিত। এক্ষণে আপনার বক্তব্য, অভিযোগ, অনুযোগ, আবেদন, নিবেদন সকলই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন। আর এক কথা বলি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। বন্ধুর নিকট বন্ধু যেমন ভাবে তাহার মন-প্রাণের কথা অসঙ্কোচে বলিয়া থাকেন, আপনিও তেমনি ভাবে আপনার সমুদয় বিষয় ব্যক্ত করিবেন, আমার ইহাই একমাত্র অনুরোধ। আর যদি এই প্রবাসীকে বন্ধুত্বে বৃত করিতে পারেন, তাহা হইলে সে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিবে।" মহানুভব সাহেবের কথায় প্রণবকৃষ্ণ যেন নব-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—"আপনার সৌজন্য—আপনার সরলতা—আপনার মহৎপ্রাণ দেবতারই সঙ্গে তুলনীয়। দেব প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াই আপনি রাজপদে—রাজপ্রতিনিধিত্বে অধিরূঢ়। আমাদের শাস্ত্রে বলে—'ভগবান্ রাজদেহে অধিষ্ঠান করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করেন' আজ নিজের চক্ষে-কর্ণে—মনে-

প্রাণে তাহা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

"বন্যার স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায় কলিকাতা হইতে খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে আনিয়া, নারায়ণপুরে তাঁহাদের কেন্দ্র করিয়া, এই আট দিনে লোকহিত-ব্রতে যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া, সহস্র-সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আর একদিন মাত্র বিতরণ করিবার মত সকল জিনিস আছে। এখন এই বিপন্ন দেশকে রক্ষা করিবার ভার আপনার উপরেই নির্ভর করিতেছে। মাত্র সামান্য খাদ্য ও পরিধেয় অভাবে ভগবানের সৃষ্ট এতগুলি জীব একেবারে মৃত্যুমুখে যাইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতিকার প্রার্থনা আর কাহারও নিকট না করিয়া, আমাদের রাজার নিকট আমাদের সমুদয় অভাব অভিযোগ—মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বলিতে আসিয়াছি। কৃতকার্য্য হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব। অতি প্রত্যূষ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিজেদের মাথায় মোট লইয়া ত্রিশ জন কর্ম্মঠ ব্যক্তি এই কয়দিন যে ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহা আমার এই অল্প জীবনে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইতেছে। যাহাদের সামর্থ্যে কখনও নিজেদের খাবার যোগাড় করিয়া খাইতে কুলাইয়া উঠে না, যাহাদের পাচক ও পরিচারক আবশ্যক, তাহারাই পরের জন্য মাথায় মোট লইয়া দ্বারে-দ্বারে বন্যাপীড়িত বুভুক্ষিতের অন্ন যোগাইতেছে। প্রাতে বাহির হইয়া সন্ধ্যায় আসিয়া কোনরূপে শাক-অন্ন খাইয়া এই সাতদিন অতিবাহিত করিয়াছে—আরও কত দিন যে এ পরিশ্রম তাহাদের করিতে হইবে, তাহাই বা কে বলিবে? উৎসাহ তাহাদের হৃদয়ে যথেষ্ট আছে, কিন্তু ভাণ্ডার অতি ক্ষুদ্র। তাই আজ আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনায় এখানে

আসিয়াছি। এ বিষয়ে আপনি যথাসাধ্য মনোযোগী না হইলে অনাহারে, অনাশ্রয়ে প্রায় চারিশত গ্রামের লোক একেবারে অকালে কালের গ্রাসে পতিত হইবে। বিশেষ কষ্ট হইয়াছে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের। বড়লোক যাঁহারা, তাঁহারা প্রায় সকলেই এখন সহরে বাস করেন। আর দু'চারি ঘর বড়লোক—দেশের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য এখনও যাঁহারা ছিলেন,—তাঁহারা এই দুর্দ্দিনে বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর লোক খাটিয়া খাইতেছে। এ দুর্দ্দিনেও পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহাদের অন্ন-সংস্থানে তত কষ্ট হইতেছে না। সামান্য ঘরে ও সামান্য পরিচ্ছদে থাকিতে তাহাদের কোনও লজ্জা বা অসুবিধা হয় নাই। আজ এ দুর্দ্দিনে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা অনেক দিন ধরিয়া বহু লোকেও শেষ করিতে পারিবে না! প্রত্যেক গৃহ-হীনের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই শ্রেণীর লোক আহৃত হইতেছে। ব্যাপার বুঝিয়া তাহারাও তাহাদের পারিশ্রমিক সাত আট গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। এই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা পরিশ্রম করিতে সক্ষম নহে—তাহারা নিজের অভাব জানাইতে কখনও লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের মর্য্যাদা ও বংশগৌরব লইয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবুও তাহাদের সম্ভ্রম নষ্ট করিবে না। তাহাদের অভাব অনুসন্ধানে জানিতে হইতেছে। তাহার ফলে, বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পল্লীগ্রামে এত বেশী যে, তাহার তুলনা অন্যত্র আর কোথাও হইতে পারে না।”

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বলিলেন—“মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণী আখ্যা যাহাদিগকে দিতেছেন, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কি

তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি মধ্যবিত্ত কাহাকে কহেন ?”

“বংশ-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং নিম্নশ্রেণী অপেক্ষা সম্ভ্রমই যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও রক্ষণীয় এবং আর্থিক অবস্থায় ইতর অপেক্ষা হীন, শ্রমকাতর,—তাহারাই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত। হয় ত এক-জনের বিশ বিঘা জমি আছে ; তাহার চার-পাঁচটি পোষ্য। সম্ভ্রমের দিকে চাহিয়া নিজে শরীরপাত না করিয়া, জমিজমা নিম্নশ্রেণীর কাহাকে ফসলী বিলি করিয়াছেন। তাহার ফলে জমীর স্বত্বাধিকারী বলিয়া, উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধেক মাত্র নিখরচায় পাইতেছেন। বিশ বিঘার মধ্যে দশ বিঘার ফসল হইতে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া জীবন-পাত করাই কোনরূপ সম্ভব নহে ; তাহার উপর আবার ঐ কয় বিঘা জমীর রাজার খাজনা দিয়া আর কি থাকিবে! অথচ নিম্নশ্রেণী বলিয়া আমার দেশ যাহাকে আখ্যা দিতেছেন, তাহাদের স্ত্রী-পুরুষে প্রত্যেক কর্ম্মেই প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে চিরাভ্যস্ত ; যে কোনরূপ গ্রাসাচ্ছাদন হইলে আনন্দে তাহাদের জীবন কাটিয়া যায়। কোনও অভাব অভিযোগে পড়িলে তাহারা কখনও কাতর হয় না। মান-সম্ভ্রম, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাজ করিতে কখনই বাধ্য নহে। রাজার খাজনার কোন ধারই ধারে না। সময়ে চাষ আবাদ করিতে পারিলেই বেশ স্বচ্ছন্দে তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। নিজের চাষ সারিয়া অন্য ক্ষেতে কাজ করিয়া দুই পয়সা সংস্থানও করিতে পারে। আর এই ভগবানের গলগ্রহ স্বরূপ অবস্থায় হীনের আদর্শ—মধ্যবিত্ত ভদ্র-সন্তান—সব কাজের বাহিরে। প্রতি মুহূর্ত্ত নিজেদের জীবনকে ভার করিয়া তুলিতেছে। একে চিরদিনের এই অভ্যাস—তার উপর আবার এই খণ্ড-

প্রলয়ের যুগে তাহাদের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। মুখ ফুটিয়া অন্তরের কথা বলা অপেক্ষা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করাই যেন তাহারা একমাত্র গতি বুঝিয়া একবারে নিশ্চিন্ত ছিল। ভগবানের এইরূপ শাসনে তাহারা একটু অন্যদিকে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ভদ্রলোকের সন্তান—বিশেষ উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও, স্বেচ্ছায় সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া—কোন্ দেশ হইতে আসিয়া মাথায় মোট বহন করিয়া যখন কি ভদ্র-ইতর, সকল দুস্থেরই দ্বারের নিকটে দাঁড়াইতেছে, তখন যেন তাহারা বুঝিতেছে—'মান মর্য্যাদা কোন্ পথ দিয়া চলিয়া চিরদিনই সমানভাবে রক্ষা করিতে পারা যায়।' প্রকৃত কর্ম্মীর আদর্শ তাহাদের জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—তাহাদিগকে সহজ পথে আনিবার জন্য আজ যেন নিজেদের জীবনী-শক্তি তাহাদের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন। সেই সব অমূল্য জীবন রক্ষার ভার আপনার হাতে, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া আপনাদের প্রজার প্রাণরক্ষা করুন।"

"আপনার আশা ও আমার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য যাহাতে রক্ষা হয় তাহার জন্য আজ সদর আদালতে বিশেষ অধিবেশনে আমার সহকর্ম্মীদের এখনই আহ্বান করিতেছি। সেখানেই যথাকর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত হইব।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব প্রণবকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া আদালতে আসিয়া, জেলার প্রধান প্রধান কার্য্যকারকদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া, বর্দ্ধমান জেলার মানচিত্র বাহির করিয়া বলিলেন—"প্রণববাবু, আপনি নিজের চক্ষে যে সব গ্রামের অবস্থা দেখিয়াছেন ও অতীব শোচনীয় বলিয়া আপনার ধারণা হইয়াছে, সেই সব গ্রামগুলি লাল রেখায় চিহ্নিত করিয়া দিন।"

প্রণবকৃষ্ণ প্রায় একশত গ্রামের উপর লাল রেখা টানিয়া দিয়া বলিল—"নারায়ণপুরের দেওয়ান বৃদ্ধ সনাতন রায় মহাশয় নিজের অর্থে হাজার মণ চাল, পাঁচশত মণ ডাল, একশত মণ আলু ও কাপড় দিয়া এই সব গ্রামের লোকদের তিনদিন কাল রক্ষা করিয়াছিলেন—পরে কলিকাতা হইতে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া সাতদিন কাল তাহাদের রক্ষা করিতেছেন! আগামী কল্য তাহাদের ভাণ্ডার শূন্য হইবে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহকর্ম্মী—যাঁহারা পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের আদিষ্ট হইয়া বন্যার বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন—তাঁহাদের সন্ধান বোধ হয় স্বচক্ষে না হইয়া 'রাজা পণ্ডিত কর্ণেন' এই বাক্যের সাফল্য করিয়াছিলেন। সেইজন্য দুই একজন বলিয়া উঠিলেন—"একজন উদ্ধত যুবক যাহা বলিতেছে, তাহাই কি আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে? আর সাতঘাটের জল খাইয়া আমরা যে সব দেখিয়া শুনিয়া আসিলাম—তাহা কি সব ভুল দেখিলাম শুনিলাম।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—"এই 'উদ্ধত যুবক' আখ্যাধারী স্বভাব-সুন্দর প্রতিভা-মণ্ডিত যুবক নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন—এঁর কথা আপনাদের বিশ্বাস করিবার মত হৃদয় ও শক্তি আছে কি না, জানি না। শোনা কথাই যাঁহাদের দেখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাঁহাদের পক্ষে সবই সম্ভব হইতে পারে। যাক্, সে কথা আমাদের এখন আলোচ্য নহে। জীবন-মরণ সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া—আমার হিতৈষী এই ভদ্র বন্ধুর সঙ্গে আপনারা আলাপ করিতে পারেন। এখন উপায় কি? কয়দিনই বা সেই দেব-হৃদয় স্বেচ্ছাসেবকগণ এভাবে কাজ করিতে

পারিবেন ? দুই হাজার টাকা আমার নিজের হইতে এঁর হাতে দিই। যদি আপনাদের ইচ্ছা ও সামর্থ্যে বন্যা-পীড়িতের জন্য কিছু কিছু এখনই সাহায্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের দেশের ও দশের উপকার করা হয়। আর দেখুন দেখি, বন্যা-পীড়িতের সাহায্য-কল্পে আজ আর কোনও টাকা ডাকঘরে আসিয়াছে কি না,—তাহা হইলে তাহাও এঁর সঙ্গে দিন। আর প্রণবকৃষ্ণবাবু, আমি একটি পরোয়ানা দিই, যাহাতে দেশীয় মহাজনগণ এই দুর্দ্দিনে টাকায় এক আনার বেশী লাভ খাদ্যদ্রব্যের উপর না করেন।"

বেলা ৫টার সময় প্রণবকৃষ্ণ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট হইতে সর্ব্বসমেত পাঁচ হাজার টাকা লইয়া সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া উঠিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বলিলেন—"পথ অতি দুর্গম, কল্য প্রাতে যাইবার ব্যবস্থা করিলে ক্ষতি কি হইবে ?"

প্রণবকৃষ্ণ বলিল—"স্বেচ্ছা-সেবকদিগের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি—বর্দ্ধমান হইতে আজই ফিরিব। কৃতকার্য্য হইয়া জলগ্রহণ করিব। তাঁহারাও আমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন। হয় ত আমারই জন্য অভুক্ত থাকিবেন। কার্য্য-সাফল্যই আমাকে এত উৎসাহ দিতেছে যে, আমার শরীর বা মন তাহাতে বিন্দুমাত্রও অবসাদগ্রস্ত হয় নাই। আমি দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিব মনে হইতেছে। আমার ঘোটকও অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে।"

"চলুন প্রণববাবু, আপনাকে পারঘাটা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসি। অনেকদিন দামোদরের ধারে যাই নাই। একটু বায়-

সেবনও হইবে।” এই বলিয়া প্রণবকৃষ্ণের সহিত সাহেব আদালতের প্রাঙ্গণে আসিলেন। নিজের নিজের অশ্বে বসিয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে পারঘাটার নিকট আসিয়া পৌছিলেন। শত ধন্যবাদ দিয়া, অভিবাদন করিয়া প্রণব অশ্বসহ নৌকায় উঠিল। সাহেব বলিলেন—“বন্যার বৃত্তান্ত সহ সমুদায় গ্রামবাসীর একখানি আবেদন পত্র সত্বর লিখিয়া পাঠাইলে, আমি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, প্রত্যেক গ্রামেই সাময়িক ভাবে সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব। হয় ত বা আমি দুই একদিন মধ্যে এই সব স্থান পরিদর্শন করিবার জন্যও একবার যাইতে পারি। দেবতার আশীর্ব্বাদে—আপনারা সুস্থ থাকিয়া সেই সময় আমার যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। দেশের অভাব অভিযোগের প্রতিকার দেশের লোকে যতটা সহজে করিতে পারেন—ভিন্নদেশী আগন্তুক তাহা পারে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আসুন প্রণবকৃষ্ণবাবু, আর আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া দিব না। আমার মঙ্গলেচ্ছা আপনাকে বর্ম্মের মত আবৃত করিয়া রাখুক, আমার এইমাত্র শেষ প্রার্থনা।”

১২

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব দেওয়ানজী ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের সাহায্যে বন্যার চিহ্ন গ্রামের উপর হইতে মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আশ্বিন মাসে পূজার পূর্ব্বে কতকটা যেন কৃতকার্য্য হইলেন। যে কয়দিন সাহেব পরিদর্শন করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন, সেই কয়দিনই নারায়ণপুরে স্বেচ্ছাসেবকগণের সঙ্গে

মায়ার আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সকলের দেখাদেখি "গুরু" বলিয়া আহ্বান করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। দেওয়ানজী একদিন বলিলেন—"সাহেব, মুখে গুরু বল্লে হবে না, যদি শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে থাকেন, তবে তার দক্ষিণা, প্রণামী সবই দিতে হ'বে। নতুবা কাজে মুখে পৃথক হ'য়ে দাঁড়াবে। অন্তর বাহির পৃথক্ হ'য়ে যে আপনার হৃদয়ে একটা রেখা পড়ে, সেটা আমার মত সৌভাগ্যবান্ গুরুর পক্ষেও মর্য্যাদার নয়, তাই আমিও এর একটা কিছু শেষ কত্তে চাই। সে প্রণামী বা দক্ষিণা স্বর্ণ রৌপ্যে পূরণ হ'বে না। সাহেব, দক্ষিণার স্বরূপ একটা কাজের ভার আপনাকে নিতেই হ'বে। আর আমি যখন এমন সব শিষ্য ভগবানের দয়ায় বিনা আয়াসে লাভ কর্ত্তে পেরেছি, তখন আমার সে ইচ্ছাটা তাদের দিয়ে পূরণ করিয়াই বা না নেব কেন?"

সেদিন সন্ধ্যার সময় সমবেত স্বেচ্ছাসেবকগণের সমক্ষে দেওয়ানজী বন্যার রাত্রির সকল কথা বলিলেন—"সদাশিববাবু কোথায় আছেন তাহা আমরা কেহই জানি না। এই দুর্দ্দিনে এই সংবাদে মায়া যদিই একান্ত কাতরা হইয়া আমাদের সেবাব্রতে গোল বাধাইয়া বসে, সেইজন্য এই মিথ্যার সৃষ্টি আমিই করিয়াছি যে, 'পীড়িত অবস্থায় সদাশিববাবু সাত-আনীতে আছেন।' এদিকের কাজ যাহা কিছু সবই যেন তাঁহারই পরামর্শে হইতেছে, মায়া এইরূপই জানে। আপনার দয়ায় এখন বন্যার দায় হইতে এক প্রকার সকলে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইয়াছে। এখন যে যাহার সামর্থ্যে নিজের সুখ সুবিধার চেষ্টা করিতে পারিবে। অথচ অভাব হইলে তাহাও সরকার হইতে ঋণরূপে গ্রহণ করিতে

পারিবে। এ সব যাহা কিছু করিয়াছিলেন, সবই সকলের পক্ষে আশাতীত সুবিধার হইয়াছে। কিন্তু সাহেব, এইবার আমি কি লইয়া থাকিব, মায়াকেই বা কি দিয়া ভুলাইয়া রাখিব। যাহা লইয়া এই কয়দিন কাটাইবার সুবিধা হইয়াছিল—তাহা ত আজ শেষ করিয়া আপনারা চলিয়া যাইতেছেন। সাহেব, করুণাপরবশ হইয়া সদাশিববাবুর সন্ধানের জন্য কোনও প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমার বার্দ্ধক্য-শক্তি যেন ক্রমশঃ আমাকে শেষ-অবসাদে পৌছাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। আর পারি না এইবার যেন জীবন শেষ হইলেই ভাল হয়। মৃত্যু-চিন্তা আমাদের পক্ষে পাপের হইলেও, বিপদের উপর বিপদ আসিয়া যেন ধৈর্য্যশক্তি নষ্ট করিয়া সেই পাপবুদ্ধিকে উৎসাহিত করিতেছে।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—“আমার শক্তিতে যতদূর সম্ভব, আপনার অনুরোধ রক্ষিত হইবেই। তবে সত্বর যে কার্য্যোদ্ধার হইবে, এমন কোন আশাই করা যায় না। দেখা যাউক, কতদূর কি করা যায়। নিরুদ্দিষ্ট হইবার কোনও কারণও ত বুঝিতে পারিলাম না। গুরু, আমার সাধ্যমত যত্ন-সহকারে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব। বিশেষ, মায়াদেবীর আতিথ্যে আমরা সকলেই প্রীত হইয়াছি। এ বিপদের দিনে মায়ার মত অল্পবয়স্কা বালিকা যে সাহসে বুক বাঁধিয়া, নিজের বিপদ তুচ্ছ করিয়া, অসামান্য উপকার করিয়াছে, তাহাতে দেশের লোক তাহার কাছে অশেষ ঋণে ঋণী। তাহার যৎসামান্য উপকার করিতে পারিলেও, কথঞ্চিৎ ঋণ পরিশোধ হইবে। যাহা হউক, এ বিপদের শেষ হইলে মায়ার বিবাহের সময় যেন আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া হাসি মুখে এখানে আসিতে পারি।”

দেওয়ানজী বলিলেন—"সদাশিববাবুর সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত মায়ার বিবাহ যে স্থগিত থাকিবে ইহা নিশ্চিত। সে অনির্দ্দিষ্ট দিনের কতদূরে যে সীমা, তাহা কে বলিবে সাহেব! তবে যতদিন পরেই সে শুভদিন আসুক না কেন, সে শুভদিনের নিমন্ত্রণে এই সব মহৎপ্রাণ, মহানুভবদিগকে স্মরণ না করিলে আমার কর্ত্তব্যে ত্রুটি থাকিবে, আমার আনন্দ হইবে না। আর আপনারাও স্বীকার করুন, এই বন্যার স্মৃতিরক্ষার জন্য দয়া করিয়া মায়ার বিবাহের সময় এখানে আসিবেনই।"

দেওয়ানজী অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ফিরিয়া আসিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে দেওয়ানজী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ভাই সব, এই আশী বৎসর বয়সের মধ্যে এমন প্রাণ—এমন দয়ার শরীর—এমন পরদুঃখ-কাতরতা—ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও এমন ভাবে পরের জন্য নিজেদের সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিতে তোমাদের ব্যতীত আর কাহাদিগকেও দেখি নাই। তোমাদের সেবাব্রত শিক্ষা করিবার জন্য আমার মন, প্রাণ, শক্তি—সব যেন তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিয়াছে। আমার যতটুকু জীবন এখনও এ মরজগতে থাকিবে—তাহাই যেন তোমাদের এই সেবাব্রতে ব্রতী হইয়া তোমাদের পুণ্য-স্মৃতি বহন করিতে সমর্থ হয়। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর তোমরা—তোমাদের উপর আমাদের কল্পনা যেন কার্য্যে পরিণত হইয়া দেশের কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া যায়। ভাই সব, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাদের আর কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে? ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, চির-নির্ম্মল শান্তি ও মঙ্গল যেন তোমাদের সর্ব্ব সময়ে সহায় হন।"

আর কোনও কথা সেই বৃদ্ধের কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। বৃদ্ধ দেওয়ানজীর কণ্ঠ আবেগে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই স্নেহমুগ্ধ বৃদ্ধের জন্য কাতর হইয়া সকলেই নিজের নিজের অশ্রু সংবরণ করিবার জন্য চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

দেওয়ানজী অতি কষ্টে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, সেই দিনই শয্যা গ্রহণ করিলেন। একেবারে সাত দিন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তাহাতে সকলে মনে করিয়াছিল, বোধ হয়, বন্যার কয়দিনের এই অতিরিক্ত পরিশ্রমেই বৃদ্ধের চির-অটুট স্বাস্থ্য এইবার বুঝি শেষ শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। মায়া সাত-আনীতে সংবাদ দিলে পর জ্ঞানবাবু আসিলেন। জ্ঞানবাবুকে একা আসিতে দেখিয়া, মায়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াও নানা উদ্বেগে সদাশিববাবুর জন্য অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা কতদিনে এখানে আসিতে পারিবেন, কেমন আছেন, আমায় একা রাখিয়া কি করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন; তার উপরে এই দেওয়ান জেঠামশায়ের সংশয়াপন্ন ব্যারাম।"

কতদিনে বাবা এখানে আসিতে পারিবেন, এই কথা বোধ হয় শতবার জিজ্ঞাসা করিয়াও মায়ার মনে হইতেছিল, বুঝি এ কথাটা ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল না। নানা প্রকারে আশ্বাস দিয়া জ্ঞানবাবু অবশেষে বলিলেন—"মা আমার আসায় কি তুমি কোন প্রকারে সন্তুষ্ট নও? কেবল নিজের বাপের কথাই জিজ্ঞাসা কচ্ছ? আমার কথা কি একেবারে ভুলে গেছ মা? সেই ছোটবেলায় যখন আমার কোলে বসে বল্‌তে জেঠামশাই বাবা বড় দুষ্টু, তুমি খুব লক্ষ্মী, আমি তোমার কাছেই থাক্‌বো, বাবার কাছে যাব না, বাবা আমায় কেবল কেবল বড় বকেন।

আজ সেই ছোট্ট আমার মা-টি, মস্ত বড় হ'য়ে কেবল বাপের কথাই বল্‌ছ, আর ছেলের কথা মনে নাই। কিন্তু মা, তোমার ছেলে তার মায়ের কথা ভুল্‌তে পারে নি ব'লেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। তবে মা এ ভাবে এখন আর সেখানে নিয়ে যেতে আমার মন উঠ্‌ছে না—তাই দু'দিন পরে সাত-আনীতে বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌বো। আমি একা আজ নানা কারণে এখানে আস্‌তে বাধ্য হয়েছি। সদাশিব যেখানেই থাক না কেন, তার জন্য তোমার ব্যস্ত হ'বার কি আছে, আমরা ত রয়েছি। অবশ্য বাপকে না দেখে মেয়ের মন খারাপ হয়। তবে কি না, এইটুকু আস্‌তে যদি তার শরীর আরও খারাপ হ'য়ে ওঠে, তাই ডাক্তারদের কথায় বাধ্য হ'য়ে তোমায় একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, তার জন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই। এখন দেওয়ানজী যাতে শীঘ্র শীঘ্র সেরে ওঠেন, তার জন্য প্রাণ দিয়ে সেবা কর মা! দেওয়ানজীর একদিন সবই ছিল,—খুব বড় ঘরে—উচ্চবংশে ওর জন্ম, খুব উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। স্ত্রী-পুত্র কন্যা সবই অকালে মরিয়া যাওয়ায়, দেশে আর মন স্থির রাখিতে না পারিয়া, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তোমারই পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঠাকুরদাদা মহাশয়ের নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করিয়া একদিন এখানে আসেন। সেইদিন হইতে সাধুভাবে কার্য্য করিয়া, সামান্য কার্য্য হইতে এত বড় সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তার পদ নিজের চেষ্টায় গ্রহণ করিয়াছেন। এমন নির্ম্মলচরিত্র—কর্ত্তব্যপালনে এমন দৃঢ়নিশ্চয় মানুষ দেখা যায় না। এঁর গুণমুগ্ধ হইয়াই স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয় এই সব অক্ষয় কীর্ত্তির স্থাপনা করেন। স্কুল, টোল, চিকিৎসালয়, অনাথ-আতুর-সেবাশ্রম প্রভৃতি যাহা কিছু

দেখিতেছ, সবই এই দেওয়ানজীর মন-প্রাণ-শক্তি দিয়ে তৈরী। এ সব বন্যার প্রকোপে প'ড়ে শ্রীহীন ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু, এই বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে যদি কোনও প্রকারে যমের সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঁচাতে পার মা, তাহ'লে আবার এ সব যেমন ছিল তেমনই হ'য়ে উঠবে, এ কথা নিশ্চিত জেনো মা। তাই আমি ছুটে এসেছি - এঁকে দেখতে। এত বড় কর্ম্মবীর, আদর্শ লোক এ দেশে আর দেখিনি। চিরদিনের মধ্যে কখনও একটা অন্যায় ভুল এঁকে দিয়ে হ'তে কেউ কখনও দেখেনি। সামান্য আয়—এঁরই অধ্যবসায়ে, যত্নে, চেষ্টায় আজ এত বড় হয়েছে। তার চেয়ে বেশী কথা মা, তোমাকে বুকে ক'রে সেই ছ'মাসের বেলা হ'তে এত বড় করেছেন। এত আদর, যত্ন তোমায় কেউ কর্ত্তে পারেনি মা, ইনি যা করেছেন। তোমার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী রাখবার কথা একদিন আমাদের মধ্যে পরামর্শ হচ্ছিল। সে কথা ওঁকে জানান ইচ্ছে করেই হয়নি। কারণ, মত দেবেন না ব'লেই আমাদের মনে ধারণা ছিল। যখন সেটা কার্য্যে পরিণত ক'রে জানান হ'ল, তখন উনি বল্লেন,- 'এই এত বড় বংশে মোটে একটা মাত্র মেয়ে, তাও যদি আবার প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত ওর উপর চালিয়ে শিক্ষা দিতে বসেন, তাহ'লে বড় বিষময় ফল হবে। ওর জীবনটাই নষ্ট হ'য়ে যাবে। যা হবার হবেই, তবুও বলি—মেয়েকে মা হ'বার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই সকলের উচিত, অন্য শিক্ষায় তাদের পাতিত্য আসে। নারীর মর্য্যাদার সীমা মাতৃত্বে যতদূর বিকাশ পায়—অপর দিকে—ভোগ বিলাসের দিকে তাঁদের সে সম্মান ঠিক ততটা কমে যায়। এই বুঝে কাজ করলেই ভাল হয়।' সেইদিন থেকে উনি আর তোমার শিক্ষার সম্বন্ধে

কোন কথা অভিমান ক'রে বলেননি। তিনি নিজে যতটা তোমায় স্নেহের আবরণে রেখেছেন---চিরদিন যে ভাবে দেখেছেন—তার কণামাত্রও আমাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। দেওয়ানজীর এই জীবন-মরণ সন্ধিস্থানে একা তোমাকেই সর্ব্বপ্রকারে সেবা কর্ত্তে হ'বে—যেন কোনও প্রকারে উনি এতটুকু কষ্টও বুঝতে না পারেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা; ভগিনী থাকিলে—যেমন ভাবে এঁর সেবা করত, তোমাকেও তেমনি করতে হ'বে। এই সব কর্ত্তব্য-জ্ঞান তোমার আছেই—তুমিও প্রাণপণ করিয়া তাঁর সেবা কচ্ছো ও করবেই, একথা জানা সত্ত্বেও আমি তোমায় বারবার ক'রে মনে পড়িয়ে দিচ্ছি মা! দেখ মা, তোমার কর্ত্তব্য যেন কোথাও অঙ্গহীন না হয়। সদাশিব এখানে না আসা পর্য্যন্ত আমিও সবদিন যে এখানে থাকতে পারবো, তাও ত বলতে পারি নি। সামনে পূজার কিস্তি। এবারে অনেক মহালে আদায় হবে না, বানের জলে ফসল নষ্ট হ'য়ে গেছে। পেটে না খেয়ে খাজনা দেবে কোথা হ'তে! কিন্তু রাজার খাজনা আমাদের ত দিতেই হবে; না হ'লে সব বিকিয়ে যাবে, এর উপায় কর্ত্তেই হ'বে। সাত-আনী ও নারায়ণপুরের বৈষয়িক ব্যাপারে আমার একটুও সময় হবে না মা, যাতে সময়ে সময়ে এসে তোমাদের সাহায্য করতে পারি। খুব সাবধানে সবদিকে নজর দিয়ে, মান-সম্ভ্রম বজায় ক'রে থেকো মা। কখনও ধৈর্য্য হারিও না। মায়া, কে কে তোমার কাছে এখানে এখন আছেন মা!"

"ও পাড়ার মাসীমা, তার মেয়ে, আর বানের-জল—এঁরা দিনরাত এখানেই থাকেন। বানের-জল আর আমি দেওয়ান

জেঠামশায়ের কাছে সদাসর্ব্বদা রয়েছি। আর ওঁরা সব এদিকের কাজ কর্ম্ম দেখেন। কাছারীর লোকজন সব বাইরেই থাকে। বানের সময় যারা সব এসেছিল, তারা প্রায় সকলেই চলে গেছে।"

"বানের-জল আবার কার সঙ্গে পাতালে মা! সেকালে ত গঙ্গাজল পাতাতো। এ তোমার নূতন পাতান সম্বন্ধ ব'লে মনে হচ্ছে। আমি কি এর আগে আর কখনও তাকে দেখিনি?"

মায়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"না জেঠামশায়, কখনও তাকে দেখেন নাই। এই বানেই তার সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছে। সে খুব ভাল, খুব লক্ষ্মী, খুব বুদ্ধিমতী। তারা বরাবর কল্‌কাতায় থাক্‌তো, অনেকদিন আগে এ দেশেই বাড়ী ছিল। কোথায় নামটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। আমারই মত মা-বাপের এক মেয়ে। মাস কতক হ'ল বানের-জলের বাপ মারা গেছেন। কার কাছে আর বিদেশ বিভূঁয়ে থাক্‌বেন—তাই দেশে এসেছিলেন সাবেক বাড়ীতে বাস কর্‌তে। তাঁদের দেশে আসার পরেই এই বান আসে। বানের জলেই সব বাড়ী-ঘর প্রায় নষ্ট হ'য়ে গেছে। ওঁদের ওখানে আরও বেশী বান হয়েছিল। বানের ক'দিন মায়ে-ঝিয়ে ছাতে ব'সে উপোস দিয়ে কাটিয়েছিলেন। দেওয়ান জেঠা-মশায় আর—"

"কি বল্‌ছিলে—থাম্‌লে কেন মা!"

এমন সময় মায়ার বানের-জল সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাসিতে হাসিতে বলিল—"ওকে আর সে নাম কর্ত্তে নাই, তাই বল্‌বে না জেঠামশায়! আপ্‌নি যখন মায়ার জেঠা-মশায় তখন আমারও ত জেঠামশায়?" এই বলিয়া অনিন্দ্যসুন্দরী অপরিচিতা ষোড়শী হাসিতে হাসিতে জ্ঞানানন্দবাবুকে প্রণাম

করিল। জ্ঞানানন্দবাবু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"তা বই কি মা, আমায় তুমি যদি ভক্তির চক্ষে এত বড় সম্মান—আমার পরিচয় না পেয়েও দিতে পার, তাহ'লে তোমার এই বুড়ো ছেলেও যে তোমায় মায়ের সম্মান, মেয়ের আদর না দিয়ে থাকে কি করে ? হ্যাঁ, তার পর কি হ'লো ! তুমিই তোমার পরিচয় দিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত কর। তোমার সব কথা শোন্‌বার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হচ্ছে।"

"জেঠামশায়, আমার সব কথা জেনে আপনি নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পাবেন। আমার সব কথা আমি আপনার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌তেও পার্‌ব না। সময় মত মায়ার মুখে শুন্‌বেন।"

"না মা, তোমার ছেলের কাছে সব কথা বল্‌তে তুমি কোনও রকমে কাতর হ'য়ো না। যখন তোমায় মা ব'লেছি—তখনই যে তোমার সব সুখ দুঃখ আমার হ'য়ে গেছে।"

"আমার পিতার নাম হরনাথ চট্টোপাধ্যায়। জন্মাবধি কলিকাতাই আমাদের বাড়ী ব'লে জান্‌তাম। দেশের কোনও সংস্রবও আমাদের মধ্যে থাকে নাই। মা-বাবার মুখে মধ্যে মধ্যে শুন্‌তাম, বর্দ্ধমানের সন্নিকটে ধনপোতা নামক গ্রামে আমাদের আদি বাড়ী—তা এখনও আছে। গত পাঁচ ছ' বছর মাত্র দেখেছি যে, বাবা দেশের বাড়ী মেরামত কর্‌বার জন্যে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতেন। বাবা পাটের ব্যবসা ক'রে আমাদের জন্যে বিস্তর টাকা কড়ি রেখে গেছলেন। কিন্তু, অভিভাবকহীন অবস্থায় মাত্র কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর ক'রে থাক্‌লে টাকার যা সদ্ব্যবহার হয়, সে রকমেও অনেক টাকা নষ্ট হ'য়েছে। নানা কারণে বাধ্য হ'য়ে, আমরা দেশের বাড়ীতেই বাস কর্‌বার জন্য এসেছিলাম। গত চৈত্র মাসে বাবা স্বর্গারোহণ ক'রেছেন।

"এই চার মাসের মধ্যে আমাদের অনেক বিপদ গিয়েছে। বাবা বিশ্বাস ক'রে যাঁকে সঙ্গে নিয়ে কাজ কর্ম্ম শিখিয়েছিলেন— কারবারের সব ভার দিয়েছিলেন—এবং আমার—আমাদের একমাত্র অভিভাবক নির্দ্দেশ ক'রে গিয়েছিলেন, তাঁরই ব্যবহারে এই ক'মাসে আমাদের প্রায় সঞ্চিত ধনের অর্দ্ধেক নষ্ট হ'য়ে গেছে। কারবার হিসেবে যত না লোকসান হ'য়েছে—তাঁর শঠতায় তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হ'য়েছে। তাই মা বিরক্ত হ'য়ে নামমাত্র মূল্যে বাবার আফিস বিক্রি ক'রে আমায় নিয়ে দেশে এলেন। আমি সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌লাম না। সময়ে মায়ার মুখে সব শুনতে পাবেন।"

"তোমার মা ঠাকৃরুণ এখন কোথায় ?"

"তিনি কাল সকালে ধনপোতায় গেছেন। বানের মধ্যেই চ'লে আসা হ'য়েছিল—তার পর বাড়ী-ঘরের অবস্থা কি যে হ'ল তা ত আর দেখা হয় নি। আমাদের পুরাতন চাকর, আর মায়ার দেওয়া দু'জন দরোয়ান মার সঙ্গে গেছে। সেখানের সব গোছগাছ হ'লে আমায় নিয়ে যাবেন। যে ক'দিন তা না হচ্ছে, দয়া ক'রে আমায় আপনাদের এখানেই সে ক'দিন থাক্‌তে দিন্।"

"তুমি আমায় কি কথা বল্‌ছ তা জান না মা! তুমি যে আমার কত যত্নের জিনিস, তাও তুমি জান না। যাক্ সে কথা পরে হ'বে। এত কথার মধ্যেও ত তোমার নামটি একবারও শোনালে না!"

"শ্রীমতী মহামায়া দেবী।"

"আর তোমার মায়ের নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।"

"আপনি কি ক'রে জান্‌লেন ?"

"তোমার মা আমার মাতুল-কন্যা। বিষ্ণুপ্রিয়ার যখন এক বৎসর বয়স তখন বড় মামা—তোমার দাদামহাশয় মারা যান। আমার মামার বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরে। ছোট মামা তার আগে হ'তে রেঙ্গুনে। এই সময় হ'তেই মামীমা শিবপুরে বাপের বাড়ীতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে থাকেন। লোকমুখে কখন কখন তোমাদের সংবাদ পেতাম। যখন বিষ্ণুপ্রিয়ার ধনপোতায় বিবাহ হয়, তখন আমাদের কোনও সংবাদই মামীমা দেন নাই। এই সূত্রে মামীমার সঙ্গে মায়ের একটু মনোমালিন্য হ'য়েছিল। সেই হ'তেই বড় আর কেউ কারও সংবাদ নিতেন না। কলিকাতায় যখন আমি ও সদাশিব একসঙ্গে কলেজে পড়ি, তখন হরদাদাও —তোমার পিতা—আমাদের সঙ্গে পড়্‌তেন। তোমার পিতা আমাদের ক্লাসের সকলের বড় ছিলেন ; আর সব কাজেরই প্রথম উদ্যোগী ছিলেন ব'লে—সকলেই তাঁকে দাদা ব'লে ডাক্‌তেন। এক দেশে বাড়ী ব'লে আমাদের সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমরা যখন বি-এ পড়া শেষ ক'রে, দেশে চ'লে এসে বিষয় কর্ম্ম দেখ্‌তে থাকি, তখন তিনি এম্-এ পড়ার জন্য কলিকাতাতেই রহিয়া গেলেন। এম্-এ পাশ ক'রে হরদাদা শিবপুরেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। হরদাদার পিতা পূর্ব্বেই মারা যান। সংসারে—অভিভাবকের মধ্যে মাত্র মা। তাঁর মাকে পর্য্যন্ত সংবাদ দেননি। বিয়ের পর একেবারে বৌ নিয়ে দেশে আসেন। তাতে তাঁর মা তাঁর উপর অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে কাশীবাস করেন। আর কখনও দেশে আসেন নি। এই সূত্রে হরদাদাও দেশের মায়া ত্যাগ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মামা তখন পাটের কারবার কর্ত্তেন। তাঁর সঙ্গে হরদাদাও ব্যবসা আরম্ভ

করেন। ঐ পাটের ব্যবসাতেই হরদাদার খুব লাভ হয়। কলিকাতাতেই বাড়ী-ঘর করেছিলেন। দেশে কখনও আসতে শুনিনি। তোমার ঘুটি ভাই হয়েছিল না ?”

“হাঁ, আমার শনির দৃষ্টিতেই তারা একেবারে উড়ে গেছে। এ কথাও মার মুখে শুনেছি।”

“অল্পভোগী তারা,—নিজের কর্ম্মফলে এসেছিল—আবার নিজেরাই চ'লে গেছে। এমন কত হচ্ছে। তার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে নেই মা। কলিকাতায় তুমি বেথুন কলেজে পড়তে না ? কতদূর পর্য্যন্ত লেখাপড়া করেছ মা ?”

“আপনি আমাদের সব খবরই রাখেন। অথচ আমি আপনাকে কখন দেখিনি। আপনি আমাদের বাড়ী কখনও ত যান নি !”

“তোমাদের বাড়ী যাইনি বটে, কিন্তু তোমার বাবার আফিসে মাঝে মাঝে যেতাম। শেষ বছর চার আর দেখা সাক্ষাৎ একেবারে হয়নি। তারও একটা কারণ ছিল। বোধ হয় এ পর্য্যন্ত হরদাদা জানতেও পারেন নি যে, তিনি আমার ভগিনীপতি হন। তাই একটা অসঙ্গত প্রস্তাব ক'রে আমাকে একখানা পত্র দেন। সে পত্রের কথা তোমার মাও বোধ হয় জানেন। আমি পত্র-খানার উত্তর পর্য্যন্ত দিই নি। সেই থেকে হরদাদার সঙ্গে আর দেখাও করিনি। সেইজন্য তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু হ'য়েও আমি এখন এমন পর হ'য়ে গেছি। যাক্, যা হবার হয়েছে। ঘটনাচক্রে প'ড়ে তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। তোমার মা এখানে এলেই আমায় সংবাদ দিও। আমি একবার এসে দেখা করে যাব। এখন আর ধনপোতায় যাব না। তোমার মুখে বিষ্ণুপ্রিয়া সব

কথা নিশ্চয়ই শুনবে। স্বামীর বন্ধু ব'লেই হ'ক্, আর শোণিত-সম্বন্ধে ভাই বলেই হ'ক্, নিশ্চয়ই আমার যত কিছু দোষ তাদের কাছে হ'য়েছে, তা ক্ষমা করবেই। আমি এমন আশা কর্ত্তে পারি ত মা?"

"মামা—মামা, আমার—আমাদেরই দোষে আমরা সব হারিয়ে ব'সে আছি। যা হবার তা ত হ'য়ে গেছে—সে নিয়ে আর আলোচনা ক'রে কি হবে? এই দুর্দ্দিনের মধ্যে ভগবানই যখন আপনাদেরই নিকটে আমাদের পাঠিয়েছেন, তখন আর দুঃখ কি? আপনাকে আমি আর কি বুঝাব মামা! আমাদেরও সব দোস ক্ষমা করুন। আমার মনে হচ্ছে, এতদিনে দুষ্ট গ্রহের ফের আমাদের কেটে গেল। ওঃ, মা কি খুসিই হবেন যে, এসব জানতে পেরে—তা আর বলবার নয়। আমার মনে হচ্ছে, এখনই ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনি।"

"হ্যাঁ মা, এখানে কি ক'রে তোমাদের আসা হ'ল? তখন মায়া তোমায় দেখে বলতে বলতে থেমে গেল।"

"না মামা, আমায় দেখে ও থামেনি। মায়া, দেওয়ান মহাশয় আর—এই কথা বলেই তখন থেমে গেছল। তার মানে ও ওর বরের নামটি কর্ব্বে না ত!"

মায়া এই সময় সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইয়া, জ্ঞানবাবুর অলক্ষিতে মহামায়াকে একটি কিল দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

মহামায়া আবার বলিতে লাগিল—"বানের জল যেমন বাড়তে লাগল—আমরাও অমনি এক এক ধাপ ক'রে দু'তলার ঘরে আসতে লাগলাম। দামোদরের বান যে এমন ব্যাপার তা কে

জান্‌তো মামাবাবু! মাঝে-মাঝে কাগজে দেখ্‌তুম, 'দামোদরে ভীষণ বন্যা। কত লোকের বাড়ী-ঘর বানের জলে ভেসে যাওয়ায় লোকে গৃহশূন্য, দেশে অন্নাভাব। সাধারণের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।' তখন মনে হ'ত, যদি প্রায়ই এমন হয়, তবে সে দেশের লোকে সেখানে বাস করে কেন? যাতে বাড়ী-ঘর ভেসে না যায়, এমন ক'রে তারা বাস করে না কেন? কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, যাবে কোথায়? বিপদ ত এক রকমের নয়, এক দেশের মধ্যেও নয়। কল্‌কাতার মত জায়গা হ'তে আমরা এক বিপদের বোঝা ঘাড়ে নিয়েই এখানে নিশ্চিন্ত হ'তে এলাম। আর এখানেও দেখি, আরও এক বিপদ আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এসে হাজির। আমার মনে হয়, বিপদকে যারা যত ভয় করে, তাদের বিপদ ততই চেপে ধরে। আর যারা তাকে ডাকে—গ্রাহ্য করে না—কিছুতেই তার শাসন মান্‌তে চায় না, তাদের হ'তে বিপদ তত দূরে চ'লে যায়। এই বানের সময় আমরা মা-মেয়েতে একটা মাত্র চাকর নিয়ে বিপদে প'ড়ে, দু'তলার ঘরে ব'সে অনাহারে কত কেঁদেছি। শেষে মা বল্লেন, 'তোর কান্নার কি আছে? তুই কেন কাঁদ্‌চিস্‌। বেটাছেলেদের মত লেখাপড়া শিখেছিস্‌, সাহস কিংবা বুদ্ধি তাদের মত আয়ত্ত কর্ত্তে পেরেছিস্‌ কি? আমি ত তোর মত হাউমাউ ক'রে কাঁদ্‌ছি না। আমার চোখে জল আস্‌ছে কেন তা জানিস্‌—তোর কান্না দেখে। আর তোকে এত ক'রে মানুষ ক'রে মনে হয়েছিলো, তোর হ'তেই ছেলে-মেয়ের দু'কাজই পাওয়া যাবে। এখন দেখ্‌ছি, আমাদের ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। বিলেতী পড়া পড়ে শেষ এই হ'ল যে, নিজের জীবনটা ব্যর্থ কর্‌তে বসেছিস্‌, আর আমাদেরও ব্যর্থ ক'রে দিলি। যা বাবু, আমার

সাম্‌নে থেকে একটু সরে যা।' মায়ের এই কথা শুনে আমি যেন নূতন একটা পথ দেখ্‌তে পেলাম। ধীরে-ধীরে ছাদে এসে চার্‌দিক্‌ চেয়ে দেখ্‌লাম, জনমানব কোথাও দেখা যায় না। কেবল চারিদিকে জল। তখন সেই ছাদে ঝড়ে-ভাঙ্গা ঘরের যত সব ভাঙ্গা দরজা ও কাঠ জড় ক'রে, একটা মস্ত বড় আগুন জ্বালিয়ে, পাশে চুপ ক'রে ব'সে রইল্‌ম। আমি মনে এই ধারণা ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দিলুম, যদি কেউ আলো দে'খে আমাদের নিতে আসে। সমস্ত রাত্রি আলোটা একভাবে রাখ্‌বার জন্য আমি সেদিন একটুও ঘুমুইনি। পরদিন সকাল বেলা দেওয়ানজী নৌকা ক'রে এখানে এসে কতকগুলা চাল, চিঁড়ে, গুড় আমায় দিয়ে ব'লে আসেন—'মা, আজই তোমাদের এখান হ'তে নিয়ে যাব। এখনকার মত এই সব খেয়ে কোন রকমে একটু শান্ত হ'য়ে থাক। এ নৌকায় দু'জনের বেশী লোক যাবে না। আমরাই দু'জন আছি। বড় নৌকা নিয়ে, আজই আমরা আস্‌ব।' সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দেওয়ানজী আর প্রণব-দাদা আমাদের এখানে নিয়ে আসেন।"

মহামায়া এখানে এসেই মায়ার সঙ্গে যে সূত্রে বানের-জল পাতায় তাহাও নিম্নে বিবৃত হইল—

মহামায়া এ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই মায়াকে বলে, "ভাই আমার খুব পিপাসা পেয়েছে, একটু জল দাও।" মায়ার কাছে জল চাওয়াতে, মায়া তাহার হাতে জল দিয়ে বল্লে, "এই লও ভাই, বানের জল, এতেই তোমার তৃষ্ণা দূর কর।" মহামায়া তখন জল খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে মায়াকে বল্লে, "চোখের জল ক'দিন পেট পুরে খেয়েও তৃষ্ণা মেটেনি। সমুদ্রের মাঝে পড়ে, যেমন লোকে জল

জল ক'রে মরে—অথচ খেতে পায় না। আমিও তেমনি, বানের জলের মাঝে পড়ে, জল না খেতে পেয়ে, মর্ত্তে ব'সেছিলাম। এখন তোমার হাতের গুণে বানের জলও মিষ্টি হয়েছে। আমার চোখের জলে যে বানের জল বইছে, তাও একদিন তোমারই মহত্ত্বে, তোমারই হাতে পড়ে, যেন বানের জলের মতই মিষ্টি হয়। তুমি আজ হ'তে আমার 'বানের-জল'। আর বানের জলের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে ব'লে, আমিও তোমার বানের-জল।"

১৩

বৃদ্ধ দেওয়ানজীর অসুখ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁর জীবনের আশা সকলেই একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। মাত্র মায়া ও মহামায়া, তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, ভগবানের নিকট দেওয়ানজীর জীবন-ভিক্ষা করিতে করিতে, একই ভাবে সেই রোগীর শয্যায় দিন রাত সমানভাবে কাটাইতেছিল। দিন পনের পরে বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "মা, তোমাদের শুশ্রূষার গুণে এবার দেওয়ানজী বেঁচে উঠেছেন। আর কোনও ভয় নাই। জ্ঞান হওয়ার পর বেশী কথা বলিতে নিষেধ ক'রো। তোমরাও এখানে, ওঁর কাণে যাতে শব্দ না যায়, এমন ভাবেই ইসারা ইঙ্গিতে সেবার কার্য্য করো। যখন জ্ঞান—প্রথম জ্ঞান হ'বে, তখনই আমায় সংবাদ দিও। এর পরে যে সব ঔষধ দিতে হ'বে, তার যোগাড় করি।" কবিরাজ মহাশয় তাহাদের হৃদয়ে নূতন আশার দীপ জ্বালাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমাগত পরিশ্রমে যে অবসাদ তাহাদের শ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, আজ কর্ম্ম-সাফল্যে তাহাই নবশক্তির প্রেরণার মত আসিয়া,

আবার তাহাদিগকে নূতন করিয়া তুলিল। অবসাদের গ্লানি যেন মুহূর্ত্তে অধ্যবসায়ের শক্তিতে পরিণত হইয়া তাহাদের উপর অধিষ্ঠিত হইল। দেওয়ানজী দিনের পর দিন ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে আসিতে লাগিলেন।

দেওয়ানজী জ্ঞান হইবার পর হইতে মায়াকে মহামায়া, আর মহামায়াকে মায়া বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম মনে হইয়াছিল, বোধ হয় অসুখের ঘোর এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই, তাই এরূপ ভ্রম হইতেছে। কিন্তু দু'পাঁচ দিন যাইবার পরেও যখন সে ভ্রম কাটিল না, তখন সকলেই মনে করিলেন—এই অসুখে দেওয়ানজীর মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দেওয়ানজীর যখন এইরূপ অবস্থা, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ধনপোতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। দেওয়ানজী পথ্য পাইলে পর, তিনি মহামায়াকে লইয়া ধনপোতায় যাইবেন, এমনই মনে-মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু, দেওয়ানজীর এই ভ্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, এরূপ অবস্থায় সত্বর যাওয়া তাঁহার পক্ষে কোনরূপেই সম্ভব হইবে না। মহামায়াকে দেখিতে না পাইয়া দেওয়ানজী আবার যদি অসুখে পড়েন, তাহা হইলে হয় ত আমাদের জীবন রক্ষকের প্রাণহন্ত্রী হইতে হইবে।

জ্ঞানবাবু ইতিমধ্যে এখানে আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট দেওয়ানজীর সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন, "দেওয়ানজীর অন্ন পথ্য পেতে এখনও একমাস দেরী আছে। এর মধ্যে বোন্, তোমাদের যাওয়া হ'বে না। তা ছাড়া, এই এত বড় ভ্রমটা যখন ওঁর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তার প্রতিকারের জন্যে কবিরাজ

মহাশয়ের কথামত আমাদের চলাও উচিত।” কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, “শরীরে বেশ বল পেলে পর, দুর্ব্বলতার জন্য এখন যে ভ্রম, তা নষ্ট হ'য়ে যাবে। বেশী বয়সে এরূপ ভ্রম কারও কারও অল্প দিনের জন্যই হ'য়ে থাকে। সাম্‌নে এই মহাপূজার সময়, তুমি যদি এখানে না থাক, তবে এ বাড়ীর এতদিনের পূজো বুঝি বা বন্ধ হ'য়েই যায়। দেওয়ানজী ভাল থাক্‌লে, আর কাকেও এ সব দেখ্‌তে হ'ত না। যখন এঁদের এই বিপদের মাঝে দৈবচক্রে এসে পড়েছ, তখন মায়ের পূজা যাতে সুশৃঙ্খলায় হয়, তার ব্যবস্থা করাই উচিত।”

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, “আপনার যদি তাই ইচ্ছে হয়, তবে আর অন্য কথা কি আছে। তাই হবে। কিন্তু দাদা, আমার মন বড়ই চঞ্চল হ'য়ে রয়েছে, এ মন নিয়ে কি ক'রে মায়ের পূজার আয়োজন করব। আমার আশা-উদ্যম সবই একেবারে গেছে। হয় ত শত ত্রুটীতে অপরাধের বোঝা আরও বেড়ে যাবে।”

জ্ঞানবাবু বলিলেন, “না বোন্‌, তা হয় না। দেবতার কাজে একবার মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পার্‌লে—দেবশক্তি নিজেই যে তার ওপর দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেন। আমাদের ক্ষমতা কি যে মায়ের পূজার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান কর্‌তে পারি। মাতৃপূজায় সন্তানের অধিকার সব সময়েই আছে। কর্ম্মের উপর দিয়ে মনের অবস্থা যখন যেমন তিনি করিয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর পূজা তেমনই হ'বে। তুমি, আমি শত কর্তৃত্ব ক'রেও যা হ'বার তার এতটুকুও অন্যথা কর্‌তে পারি কি?”

“মায়ের উপর—দেবতার উপর এতটা প্রাণপোরা বিশ্বাস থাক্‌লে, আজ আমার এ দশা হ'বে কেন দাদা!”

"এখনও তুমি মন ঠিক করতে পারনি বোন্! কেন দিদি, বৈধব্য কি তোমারই এই নূতন হ'য়েছে। এর আগে কি আর কেউ বিধবা হয়নি—না, এর পর আর হ'বে না। চিরদিনই এ সব হচ্ছে এবং হ'বে। যাঁর অভাবে মনে অশান্তি, তাঁর দিকে চেয়ে—তাঁকে ভেবে—তাঁর পরিণতি দেখে মনের মধ্যে তাঁর স্বরূপ ধ্যান করতে যদি না পার বোন্,—তাহ'লে যে তোমার সারা-জীবনের কর্ত্তব্যের ত্রুটী থেকে যাবে। মানুষ কি কখন একে-বারে মরে যায়! কখনও ধ্বংস হয় না। তিনি নিত্য শাশ্বত—অবিনাশী—সনাতন। মাত্র আধার—এই রক্তমাংসের জীর্ণ-শরীর ত্যাগ ক'রে অন্য নূতন আধারে আশ্রয় লন। আচার বা পুণ্যফলে সংস্কারহীন হ'য়ে, এই সনাতন পুরাণ পুরুষ পূর্ণসত্তার সঙ্গে এক হ'য়ে যান। আমাদের শাস্ত্রে বলেন, মানুষের দেহত্যাগ হইলেই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই আমরা ভগবৎ আরাধনায় আমাদের সব পেতে পারি। আর তিনিই যে সর্ব্বময়। তাঁকে পেলে স্বামী পুত্র সবই পাওয়া হবে। তাঁর সেবায় সকলেরই তৃপ্তি হয়। আর তাঁর সেবা না করে—শুধু মৃতের জন্য মনের মধ্যে হা-হুতাশ কর্‌লে যে মৃতের প্রতি অসম্মান ক'রে তাঁর পুণ্য নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়। মৃতের সদ্গতির জন্য—তৃপ্তির জন্য আমরা চিরদিন ভগবানের মধ্যেই যেন তাঁকে ডাক্‌তে পারি। আর সে সেবা—সে ডাক চিরদিনই যথা-স্থানে পৌছায়ই।—আর তাহাতেই আমাদের শান্তি ও পরমানন্দ।"

"দাদা, সব সময় মনের দুর্ব্বলতায় এ ধারণা থাকে না। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা। মনে বুঝেও—জেনেও দুঃখের ভারে এই সব ধারণা যেন কোথায় ডুবে যায়; আর তাতেই যেন সব সময়ে মনের ময়লা আরও সংশয়ে বেড়ে ওঠে।"

"এ হ'য়েই থাকে, তার জন্য হতাশ হবার কোনও কারণ নেই বোন্! অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের পরেও সংসারে মোহ এসেছিল। ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করেও পবিত্র যুগের দিনে মহর্ষি ব্রহ্মর্ষিদেরও মনের চাঞ্চল্যে সব পুণ্য নষ্ট হয়েছিল। এ ত মানুষের মধ্যে—দেবতাদের মধ্যেও এর চেয়ে বড় বড় ভুল হ'য়েছিল—বড় বড় পাতিত্য এসেছিল। এই ভুল, মনের এই দুর্ব্বলতা চিরদিনই আছে এবং থাকিবেই। তা ব'লে আমরা হতাশ হ'য়ে আমাদের কর্ত্তব্য হ'তে যেন কখনও দূরে চ'লে না যাই। দিনান্তে যতটুকু সময় পারি, নিশ্বাস নেবার মত অল্প সময়টুকুও যেন সেই অনাদি অনন্ত সনাতন পুরুষের যে কোন এক মূর্ত্তি চিন্তা ক'রে আমাদের জন্মজীবন সফল কর্ত্তে পারি।"

মহামায়া এই সময় আসিয়া একখানি পত্র জ্ঞানবাবুর হাতে দিয়া বলিল, "দেখুন মামা, একজন মেয়েমানুষ এই পত্রখানা আমার হাতে দিয়ে, হাতমুখ নেড়ে কি সব ইসারা ক'রে ব'লে চ'লে গেল। তার সে হাবভাব একটুও বুঝতে পারলাম না। আমি কত রকম ক'রে তাকে বসতে বল্লাম, তাও সে যেন বুঝতে না পেরে চ'লে গেল। মায়ার নামে চিঠি। মায়া পূজোর ঘরে আছে। আমি আমার কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে পত্রখানা পড়েছি। প'ড়ে মনে হ'ল, যখন আমার হাতেই এ পত্রখানা এসে পড়েছে, তখন বোধ হয়, বিধাতার ইচ্ছা নয় যে মায়া এ পত্র ঠিক এ ভাবেই এখনই পায়। আপনি দেখুন দেখি, এ পত্রখানা কার হাতের লেখা ব'লে আপনার মনে হয়।"

জ্ঞানবাবু পত্রখানা বেশ ক'রে দেখে বল্লেন, "পত্রের লেখা

কার তা বল্‌তে পার্‌ছি না। তবে সহিটা যে সদাশিবের তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।"

সেই পত্রের চারি পৃষ্ঠাই একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখিয়া বলিলেন, "যে লেখা আশৈশব দেখে আস্‌ছি, তাতে ভুল হবার কোনও কারণ নেই। এ সহি সদাশিবেরই। কিন্তু আর আমি চেপে রাখ্‌তে পারি না মা! দেওয়ানজী সে কালের শক্তি নিয়েও যখন এই ব্যাপারে মাথা খারাপ ক'রে বস্‌লেন, তখন আমারও সে অবস্থা এই কবে আসে দেখ।"

"কি বল্‌লেন মামা, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"এখন পার্‌বে না মা, পরে সব শুন্‌বে। পত্রখানা তুমি মায়াকে দিয়ে এস। বিষ্ণু, তুমি দিদি আমার সঙ্গে দেওয়ানজীর ঘরে চল। আমার মাথাটা যেন একটু ধরেছে। এখন বেশী কথা কইলে মাথাটা আরও বেশী ধ'রে যাবে।"

মহামায়া ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া দেখিল—মায়া পূজা শেষ করিয়া ঠাকুর ঘর হইতে চরণামৃত লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মহামায়ার হাতে পত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কার পত্র দিদি! কে দিয়েছে?"

মহামায়া বলিল—"তোমার পত্র। তোমার পিতাঠাকুর দিয়েছেন।"

"বাবা আমায় পত্র দিয়েছেন! কে নিয়ে এল?"

"চিনি না তাকে।"

"জেঠামহাশয়ও তাকে চেনেন নি।"

"একজন অজানা বোবা কালা মেয়েমানুষ আমারই হাতে পত্র দিয়ে তখনই চ'লে গেছে।"

"বেশ লোক ত সে। আচ্ছা, এখন চল দিদি, দেওয়ান জেঠা-মহাশয়কে চরণামৃত খাইয়ে দিয়ে, সেইখানেই বাবার পত্র পড়া যাবে।"

১৪

জ্ঞানবাবু দেওয়ানজীর ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তিনি বালিশে ঠেস্ দিয়া বেশ সুস্থের মতই নিজে নিজে বসিয়া রহিয়াছেন। আর নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আজ এত সকালে দেওয়ানজী জ্ঞানবাবুকে দেখিয়া, আরও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সাত-আনীর বাবুর চোখে ধূলো দিয়ে, একটা লোক আমাদের বাড়ীর ভেতর এসে, একখানা পত্র দেবার অছিলে ক'রে ভেতরের পথ-ঘাট সব জেনে গেল।"

"আপনি কি ক'রে জান্‌লেন? এর মধ্যে এ কথা কে আপনাকে ব'লে গেল? মহামায়া কি এ ঘরে এখন এসেছিল?"

"বাবা! এত প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দেবার শক্তি এখন আমার নাই। যাক্, এখনও সে লোকটা এ বাড়ীর সীমানা ছেড়ে বাহিরে যায় নি। যেমন ক'রে হ'ক্ তাকে আগুলে রাখুন। না হ'লে বিপদ আরও বেড়ে যাবে।"

"যে এসেছিল, সে মেয়ে মানুষ, তাকে ধ'রে রেখে কি হ'বে?"

"অসুখ শরীরে বেশী বকাবকি ক'রে বোঝান আমারও পক্ষে সম্ভব হবে না। বাবু! এখন দয়া ক'রে আমার কথাটা রাখুন। এখনই সব রহস্য প্রকাশ পাবে। সে মেয়েমানুষ হ'তেই পারে না।"

জ্ঞানবাবু তখনি বাহিরে গিয়া দরওয়ানকে হুকুম দিলেন, "সদর খিড়কীর দুরজা একদম বন্ধ রাখ। আমি আবার হুকুম

না দেওয়া পর্য্যন্ত যেন একজন লোকও—কি মেয়ে কি পুরুষ, কেহই যেন বাহিরে যাইতে না পারে।”

জমীদার বাড়ীর শিক্ষিত দরওয়ান তখনই হুঁসিয়ার হইল। যথাকর্ত্তব্য সাধনে বাবুর হুকুম মাথায় করিয়া লইয়াছে জানাইবার জন্য সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

জ্ঞানবাবু বা'র মহলের প্রত্যেক লোককেই চিনিতেন। তন্ন তন্ন করিয়াও শেষে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, দেওয়ানজীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “বা'র দিকে কাহাকেও পাওয়া গেল না। ভিতর দিকে যদি থাকে ত বলা যায় না।”

“বুঝেছি, আপনি পার্‌বেন না। মায়াকে একবার ডেকে দিন ত! সে একবার ভেতর-বার সব দিক্‌টা দেখে আসুক, মহামায়াও সঙ্গে যাক্। কি জানি হঠাৎ যদি কেউ অপমানই করে বসে।”

এমন সময় মায়া ও মহামায়া সে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়া দেওয়ানজীর মুখে চরণামৃত ঢালিয়া, হাতটি তাঁহার বক্ষে একবার বুলাইয়া দিয়া, প্রণাম করিয়া দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ কেমন আছেন, জেঠামশায়?”

দেওয়ানজী বলিলেন, “আজ মা খুব ভাল আছি। এ ঘরের সব কটা জানালা কপাট একবার খুলে দিলে ভাল হ'ত। এখানে ব'সে ব'সে বাড়ীর ভিতরের চারদিকের পথ ও খালি জায়গা সবই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।”

একজন প্রবীণ ভৃত্য আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। আদেশ শুনিয়া ঘরে আসিয়া অনেক দিনের বন্ধ করা সব কপাট জানালা খুলিয়া দিল। এই অষ্টকোণ ঘরখানির চারিদিকে অনেক জানালা

ও কপাট থাকা সত্ত্বেও চারি কোণে চারিটি খুব বড় বড় জানালা ছিল।

বাতায়ন পথ মুক্ত হইলে পর, দেওয়ানজী সেই খানসামার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নদেরচাঁদ, ঘরের চারিদিকে যে সব আয়না খাটানো রয়েছে, এ সব কেন আর পরিষ্কার করিস্ না। তোদের সব হ'য়েছে কি? মনে করেছিস, বুঝি বুড়ো এবার আর বাঁচবে না। তোদের যার উপর যে কাজের ভার দেওয়া আছে, তা ঠিক ঠিক যদি না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তোদের কি শাস্তি দেওয়া উচিত বল্ দেখি। যার বাড়ী, তিনি যখন তোদের বিশ্বাস ক'রে সব রক্ষা কর্‌বার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, তখন তোদের এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বার সাহস কোথা থেকে এল? আজ সকলকেই সাবধান ক'রে দাও, যেন কাল কারও কোনও কাজের ত্রুটী দেখ্‌তে না পাই। কাল সব জিনিসই আমি নিজের চোখে দেখে বেড়াব।"

নতশিরে যথাকর্ত্তব্য সমাধা করিয়া নদেরচাঁদ অপর আদেশের অপেক্ষায় বাহিরে যাইয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল; এবং সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই ইঙ্গিতে ত্রিকাল বৃদ্ধের আদেশ জানাইয়া দিল। জমীদার বাড়ীর মধ্যে মুহূর্ত্তে যেন কাজের সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু সব নির্ব্বাক্। কাহারও কণ্ঠের শব্দ কাহারও কর্ণে গেল না। বন্যার পর হইতে সকলেই অন্য অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। তারপরই দেওয়ানজীর অসুখে লোকজন সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিল। এখন তাহাদের সে সব হাঙ্গামা নাই বটে, কিন্তু আলস্য আছে ত!

দেওয়ানজী বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অনেকদিন

এমন আলো, এমন বাতাস দেখি নাই। তাই, আজ যেন আমার কাছে সব নূতন ব'লে মনে হচ্ছে। দূরের নজরটা যেন অসুখে পড়ে অনেকটা কমে গেছে। পূর্ব্বে যতদূর পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে পেতাম, এখন আর ততদূর দৃষ্টি যেতেই চাচ্ছে না। এখন যেন সব ইন্দ্রিয়শক্তিই তাদের কাজে আমার চারদিকে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। আর আমি তাদের অনুরোধ করে বল্‌ছি—আরও দিনকতক না থাক্‌লে থাকি কি ক'রে, আমার জন্ম-জন্মান্তরের সাথী, তোমরা আমার মায়া কাটাতে চাইলেও আমি পারি না। আমার মন বলিতেছে, ওগো মহাশয়গণ, তোমাদের মায়া কাটাইতে পারিব না। এত জন্মের আলাপ তোমাদের সঙ্গে—একটা কিছু সার্থকতার উপহার না দিয়া শুধু শুধু প্রত্যেক বার্দ্ধক্যের সময়ই যে এমন করে চলে যাবে, তা হবে না। আমার মনের বার্দ্ধক্য না হ'লেও তোমরা যে জোর ক'রে আমার শরীরকে বৃদ্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে যাবে তা হচ্ছে না। এবারে যদিই এভাবে যাও, তবে এই উপকারটুকু ক'রে যাও, যাতে ক'রে তোমাদের সব কাজ একেবারে শেষ হ'য়ে যায়। হে চক্ষু! তুমি দেখার সেরা দেখিয়ে যাও—যা দেখে আর কিছু দেখবার সাধ থাক্‌বে না, যা হ'তে তুমি আমি দু'জনেই সার্থক হ'য়ে যাব। হে কর্ণ! তুমি শোন্‌বার সেরা শুনিয়ে যাও, যা [illegible] তোমার আমার কাজ একেবারে শেষ হ'য়ে যায়। হে পঞ্চেন্দ্রিয়! হে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, হে আমার শরীর ধর্ম্ম! তোমাদের শতকোটী প্রণিপাত ক'রে বল্‌ছি, এমন স্থানে পৌছিয়ে দিয়ে যাও, যেখানে তোমাদেরও সমাধি ও শান্তি আছে, আমারও আছে; কাহারও গতায়াত নাই—সুখ-দুঃখ নাই—কেবল আনন্দ—পরমানন্দ!"

অশীতিপর বৃদ্ধ দেওয়ানজীর শরীর ও বাক্য যেন আবেগভরে কম্পিত হইয়া উঠিল। বক্ষোপরি দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রুর নিম্ন হইতে যজ্ঞোপবীত তুলিয়া, দুই হস্তে ধরিয়া প্রণাম করিতে করিতে অতি ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥"

১৫

কক্ষমধ্যে প্রত্যেক দর্পণখানির উপর একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, দেওয়ানজী একখানির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি বাবু, ঐ আয়নাটায় কার ছায়া পড়েছে। কে যেন ঐ ঠাকুর মন্দিরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর মাঝে মাঝে ভেতর বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখ্‌ছে। আর হাতে ওটা কি রয়েছে বেশ নজর হচ্ছে না?"

জ্ঞানবাবু দেওয়ানজীর কথামত নির্দ্দিষ্ট দর্পণের সম্মুখে গিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "একজন লোক একখানা কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছে, আর লিখ্‌ছে।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "নদেরচাঁদ, শীঘ্র বামনকে ইসারায় ডাক্, বিপদের কপাট বন্ধ ক'রে দে। মায়াকে ফিরে আস্‌তে বল।"

নদেরচাঁদ প্রথম আদেশ পাইয়াই ছোট দর্পণ লইয়া তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া পরিচারকদের বিশ্রামাগারের

একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সেই কৃত্রিম রশ্মি বারকতক দুলাইয়া দিতেই, একজন বামন বাহির হইয়া পাগলের মত উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় আদেশের কার্য্য করিতে নদেরচাঁদ একটি কপাটের কাছে আসিয়া, তাহার চৌকাঠ উঠাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সক্ষম হইল না।

তাহা দেখিয়া দেওয়ানজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, পরিষ্কার করা হয় না, তাই ভারি হ'য়ে গেছে। নদেরচাঁদ খুব ফাঁকি দিয়েছ বাবা,—দাও, আর যে ক'দিন দিতে পার। তোর হ'য়ে এসেছে। বয়সের সঙ্গে তোর ভীমরতি হয়েছে। কি ছিলি আর কি হলি। যা, নজর ছাড়া হ'য়ে স'রে যা।"

এই বৃদ্ধের গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া, দয়াপরবশ হইয়া জ্ঞানবাবু সেই চৌকাঠ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঃ, কি ভারী এটা—ও বুড়ো মানুষ পারবে কেন? এখন এটা কি করতে হবে বলুন।"

"একহাত উঁচু ক'রে তুলে মাটীতে ঠুকে দিন।"

জ্ঞানবাবু কথামত কার্য্য করিয়া একটিমাত্র ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

নদেরচাঁদ তৃতীয় আদেশ পালন করিবার জন্য বারান্দায় যাইয়া ছোট পেটা-ঘড়ি দুই-তিনবার বাজাইয়া দিল।

অল্পক্ষণ পরে মায়া আসিয়া দেওয়ানজীর কাছে দাঁড়াইল।

দেওয়ানজী তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "সে লোকটাকে দেখতে পাওয়া গেছে। একেবারে পত্র লিখে থানায় পাঠিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হওয়া যাক্।"

মায়া বলিল, "ঐ লোকটা বাবার চিঠি নিয়ে এসেছিল।

মহামায়া দিদিকে বোধ হয় আমি মনে ক'রে বাবার পত্রখানি দিয়েছিল। ওর কি অপরাধ যে থানায় পাঠিয়ে দেবেন ?"

দেওয়ানজী বলিলেন, "তোমার বাবার চিঠি! ঐ লোকটা এনেছে! কৈ, আমি তা ত জানি না! বাবু কি লিখেছেন, পত্রখানা পড়িয়ে শোনাও ত ?"

"আমি ঠাকুর-ঘর হ'তে বার হ'য়ে দেখি, দিদি আমার পত্রখানা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছেন। আমি তখন আপনাকে চরণামৃত খাওয়াতে আস্‌ছিলাম। আমি এখনও চিঠি পড়িনি, সে চিঠিখানা এখনও দিদির হাতেই আছে। দিদিকে ডাকি।"

মায়া বাহিরে যাইয়া একজন ঝিকে বলিল, "দিদিকে শীঘ্র এখানে ডেকে দে।"

মহামায়া আসিয়া দেওয়ানজীর নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, "ঐ লোকটাই আমার হাতে পত্র দিয়েছিল। যখন হাতমুখে কতরকম ইসারা ক'রে এই পত্রখানা দিলে, তখন আমার মনে হয়েছিল, লোকটা হয় ত বোবা এবং কালা। আমার কোন কথার জবাব দিলে না। যেন শুনতেই পেলে না। এখন দেখ্‌ছি তা নয়, ওর উদ্দেশ্য অন্যরকম। তখন মেয়েমানুষ বলেই মনে হয়েছিল— এখন দেখ্‌ছি আবার অন্যরকম।"

দেওয়ানজী বলিলেন—"আরও কত রকম দেখতে পাবে; এখন পত্রখানা একবার পড় দেখি,—শুনি, ওর চাল কি রকম।"

এই প্রকার কথার মধ্যে পূর্ব্ব আহূত বামন দেওয়ানজীর সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেওয়ানজী একখানি আয়নায় নবাগত পত্র-বাহকের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বলিলেন—"উহাকে এখানে আনিতে হইবে।"

বামন প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলে পর, মহামায়া পত্রখানি মায়ার হাতে দিয়া বলিল—"তোমার পত্র তুমিই পড়।"

মায়া পত্রখানি মনে মনে পড়িলেও, পত্রের মর্ম্ম তাহার মুখ চোখের উপর দিয়া এভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল যে, বহুদর্শী দেওয়ানজী ও জ্ঞানবাবুর তাহা বুঝিতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হইল না।

মায়া পত্রপাঠ শেষ করিয়া মহামায়ার হাতে দিয়া বলিল, "দিদি, তুমিই এ পত্রখানা প'ড়ে এঁদের শোনাও।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "তাই শোনাও ত মা! পড়,—এখনই আবার বামন চাঁদ ধরে নিয়ে আসবে।" বলিয়াই সকলকে হাসাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেই হাসিয়া উঠিলেন।

মহামায়া পত্রখানি পড়িলেন :—

"শ্রীশ্রীবাসুদেবায় নমঃ

"কল্যাণীয়াসু—

"মা, মায়া,- বানের রাত্রের শেষে যখন ভৈরবকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় বাহির হই, তখন মনে করি নাই যে, দয়াময় বিপদের উপর আরও বিপদে ফেলিবেন। যাক্, তাঁর দেওয়া শাসন মাথা পেতে নেওয়া ভিন্ন আমাদের কোনও উপায় নাই। নৌকায় আমরা যখন সাত-আনীর দাদার বাড়ীতে যাইতেছিলাম, তখন পথের মধ্যে নয়-আনীর নিকটেই দেববাবুর বড় নৌকার লোকজনদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। শুনিলাম, দেববাবুর আদেশমত

সাধারণের সাহায্যের জন্যই নৌকাখানি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা প্রায় সাত-আনীর বাড়ীর নিকট আসিয়াছি, এমন সময় অন্ধকারে একখানি বড় নৌকার ধাক্কায় নৌকাখানি একেবারে উল্টে যায়। জলে পড়ে গিয়ে আমি অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলাম। ভৈরবকেও খুব আঘাত লেগেছিল। সে এখনও বর্দ্ধমানের হাঁসপাতালে আছে, তাহার সংবাদ লইও। সেখানে যথাযথ বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্য দেওয়ানজীকে বলিও। আমি এখনও বেশ সুস্থ হইতে পারি নাই। আমার পক্ষে বায়ু-পরিবর্ত্তনই একান্ত আবশ্যক বলে ডাক্তার মহাশয়গণ পরামর্শ দিচ্ছেন। যা হ'ক, আরও দিন কতক থেকে, তোমার বিবাহের পরেই, বেশী দিনের জন্য পশ্চিমে যাবার বন্দোবস্ত কর্‌ব। আমার শরীরের অবস্থা এখনও স্থানান্তরে যাবার উপযোগী হয় নাই ব'লে, আমি তোমাকে এখানে আস্‌বার জন্য পত্র দিচ্ছিলাম। কিন্তু এ বাড়ীর কারও মত নয় যে, বিবাহের পূর্ব্বে তোমার এখানে আসা হয়। হিন্দুর শুভদৃষ্টি বিবাহের প্রধান অঙ্গ।

"এঁদের যত্ন, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আমি সুখেই আছি। তোমার চিন্তার কোনও কারণ নাই। দেওয়ান দাদার কি অসুখ হয়েছে? এখন কেমন আছেন? কতদিন থেকে অসুখ, সব কথা জান্‌তে চাই। আশ্বিনের খাজনা দিতে আর একমাস মাত্র সময় আছে। এ সবের কে কি কচ্ছে? কেই বা মহল দেখ্‌ছে? এর মধ্যে যতগুলো পত্র দিয়েছি, তার একখানারও উত্তর পাই নাই। তোমরা পত্র পেয়েছিলে ত? এদের ওপর চিরদিনই আমার খুবই মন্দ ধারণা ছিল। কিন্তু এদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারে আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। আমি এখানেই তোমার বিয়ে দিতে

স্বীকৃত হ'য়েছি। দেওয়ান দাদা বেশ সেরে উঠ্‌লে পর, এ পত্রখানা তাঁকে দেখাবে। অগ্রহায়ণের প্রথম লগ্নেই আমি তোমার বিয়ে সেরে ফেল্‌তে চাই। শুভকর্ম্মে দেরী কর্ত্তে নাই। তা ছাড়া, তাতে অনেক বাধা। আজ মা তোমার বিয়ের কথা তোমাকেই আমায় লিখ্‌তে হচ্ছে—এতে তুমি লজ্জিতা হয়ো না। তোমায় পেয়ে পর্য্যন্ত আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা ক'রে এসেছি যে, পুত্র-কন্যার অভাব তোমায় দিয়েই পূরণ ক'রে দেন। আমার এই রোগ-শয্যার পাশে আজ যে তোমার অভাব পূরণ করছে, সেই আমার জামাতার স্থান অধিকার ক'রে আমার পুত্রের অভাব পূরণ করবে। লোকে পুত্র দিয়ে কন্যা পায়—আর কন্যা দিয়ে পুত্র পায়। আমি দুইই একসঙ্গে পাব। কারণ, আমার কন্যাকে পরের ঘরে যেতে হ'বে না। জামাতা আমার ঘরেই যাবেন। এই অসুখে পড়ে দৈবচক্রে এখানে এসে যে এসব যোগাযোগ হ'ল, এতে আমি ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ না দিয়ে থাকৃতে পারছি না।

"খাজনার টাকা যদি কোনও প্রকারে মহল হ'তে না ওঠে, ও দেওয়ান দাদার শরীর এর মধ্যে সেরে না ওঠে, তবে আমাকে জানালে এখান হ'তেই এঁরা সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন। একথা এঁরাই তোমাকে জানাতে ব'লেচেন ব'লে লিখে দিলাম। আমি সব বিষয়েই নিশ্চিন্ত আছি। কেবল উৎকণ্ঠিত হচ্ছি তোমায় না দেখে, আর দেওয়ান দাদা ভাল নাই শুনে। পত্রে তোমাদের কুশল দিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত ক'রো। পত্র-বাহকের হাতেই পত্র দিও। কোনও কারণেই যেন এঁর অমর্য্যাদা না হয়। এঁর নিকটে আমি অনেক বিষয়ে উপকৃত।

সময়ে সাক্ষাতে সব কথাই বল্‌ব। আশীর্ব্বাদ জেনো, দেওয়ান দাদাকে প্রণাম দিয়ো। ইতি—

সন ১৩২০ সাল, ৭ই ভাদ্র। আশীর্ব্বাদক—
শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র পাঠ শেষ হইলে নদেরচাঁদ ঘরে আসিয়া বলিল,—"বামন দেখা কর্‌তে চায়।"

"একটু পরে আস্‌তে বল্‌ছি। মায়া, মহামায়া তোমরা সব অন্য ঘরে যাও, পরে আমি ডাক্‌ছি।"

জ্ঞানবাবু এ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলেন নাই। যেন হিঁয়ালির মত সব দেখিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন। মায়া প্রভৃতি সব চলিয়া গেলে পর, দেওয়ানজীকে বলিলেন—"আমার আর এখানে থাক্‌বার দরকার কি? বন্ধুত্বের খাতিরে যতটুকু দেখা শোনা করা গেছে, তাতেও বুঝি আমার অনধিকার চর্চ্চা করা হয়েছে। দেওয়ানজী, আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আমার সন্দেহ হচ্ছে। পৃথিবীর উপর থেকে যেন চক্ষু-লজ্জার পর্দ্দা আর ধর্ম্মের দোহাইয়ে বাধন এক-সঙ্গে উঠে গেছে মনে হচ্ছে। সদাশিব কোথায় থেকে আমায় এমন শব্দভেদী বাণ মারছে? যার একমাত্র কন্যাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য—যার বিষয় রক্ষার জন্য—যার মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য—নিজের দিকে একবারও চাহিবার সময় পর্য্যন্ত পাইনি, আজ সেই আমার ভাবী পুত্রবধূর উপর—তার একমাত্র কন্যার মর্য্যাদার উপর—ধর্ম্মের উপর যথেচ্ছাচার ব্যবহার কর্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছে। সদাশিব কি এতদিনে এই বুঝেছে যে, আমি তার বিষয়ের লোভে তার মেয়েকে—আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। না, এ হ'তে পারে

না, আমি তাকে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের দিক্ দিয়ে বুঝিয়ে দেখাব। তারপর আপনার নিকট—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট—আমাকে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েছে, তার বিচার আপনাকে দিয়ে করাব। এই ব্যাপার আমি সহজে হ'তে দেব না।"

"জ্ঞানানন্দবাবু, আপনি যখন আমাকে এঁদের কর্ম্মচারীর পদ হ'তে চ্যুত ক'রে, ব্রাহ্মণের আসনে বসিয়ে এর বিচার ভার দেবেন, তখন আমি কি বল্‌বো জানি না। কিন্তু এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যা বল্‌ছে, দয়া ক'রে সে কথাটা বেশ ক'রে মন দিয়ে শুনুন—আর মনে ক'রে রাখুন। কন্যা পিতৃদত্তা হ'লেও, দান একবারই করা যায়। যখন সে বাক্‌দান হ'য়ে গেছে, তখন আর উপায় নাই। যাক্ সে কথা এখন। বিবাহ-বাসরে এ সবের আলোচনা—তর্ক করা যাবে। কিন্তু এখন ভেবে দেখুন, এতদিন যে মিথ্যের জাল দিয়ে মায়ার চোখ ঢেকে রাখা গেছলো, সেটা বোধ হয় বা খুলে যায়। এখন উপায় কি? যাক্, ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্য। এতদিনে বেশ বোঝা গেল যে, সদাশিব বেঁচে আছে—আর ভাল আছে। আর আছে —দেবনারায়ণের জালে আবদ্ধ হ'য়ে। জ্ঞানবাবু, এ পত্রখানা কৃত্রিম নয় ত? আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। পত্রখানা কই দেখি? নদেরচাঁদ, মায়ার কাছ থেকে পত্রখানা নিয়ে আয়। আচ্ছা, লোকটাকে ডেকে শোনা যাক্ না, কি বলে।"

"বেশ ত, আন্‌বার আদেশ দিন। আপনার বামন ত চাঁদ ধরে আন্‌চে। দেখা যাক্ না, চাঁদের সঙ্গে আকাশ, বাতাস, জ্যোৎস্না কতটা এসেছে। আর তাতে আমাদের মনের ঘন কালো জায়গাটার কতটা আলো দিয়ে যেতে পারে।"

"যেখানে জ্ঞানের আলো দিবারাত্রই সমান ভাবে জ্বলে, সেখানে ত কোন আলোরই দরকার হয় না। যাঁরা জ্ঞানালোকের আশা করেন, তাঁরা অপর আলো চান না জ্ঞানানন্দবাবু! তাঁরা বরং জ্ঞানালোকের আশায় জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়ে দিতে পারেন; তবু সে অভাব মিটুতে অন্য কোনও আলোই চান না। তাঁরা মনে করেন, বৃহৎ অতৃপ্ত আশাও শ্রেষ্ঠ, ক্ষুদ্র তৃপ্ত আশার চেয়ে। তবে যদি জ্ঞানানন্দ তার এ সনাতন অবস্থা স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে মায়ার মায়ায় প'ড়ে—অভিমানের কালো চশমা নিজেই প'রে বসেন, তাহ'লে বন্দী সদাশিবের প্রেরিত চন্দ্রালোকের দরকার হ'তে পারে।"

১৬

বামন সেই পত্র-বাহককে জ্ঞানবাবু ও দেওয়ানজীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। শ্বেতশ্মশ্রু আবৃত বক্ষ, সুন্দর মূর্ত্তি, লোল-চর্ম্ম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া নবাগত প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেওয়ানজী একবার অতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সেই নবাগতের দিকে চাহিয়া, তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই দুইটি চক্ষুর জ্যোতিঃ দেখিয়া বামন আপনার মুখ হস্তাবৃত করিয়া একটু পিছাইয়া গেল। দেওয়ানজীর সে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সহিত পত্রবাহকের দৃষ্টি বিনিময় হইতেই সে কাঁপিয়া উঠিল, এবং নিম্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়াও সে মনে করিতেছিল—বুঝি এমনই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সে-কালের মুনি-ঋষিরা ভস্ম করিতেন। যোড়হাত করিয়া সেই ভয়াতুর আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমার এ অসমসাহসিকতার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।"

দেওয়ানজী গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ক্ষমা! তার সঙ্গে আমার কোনও পরিচয়ই নাই। অপরাধীকে চিরদিনই বিচারের হস্তে তুলিয়া দেওয়া যাহাদের চিরন্তন প্রথা, তাহাদের নিকট ক্ষমা!"

"আপনার দয়ার উপরেই আজ আমার ও আমার পোষ্যবর্গের জীবন নির্ভর করছে। আমার দোষের বিচার আপনিই করুন,—অপরাধের শাস্তি আপনিই দিন—আর সে বিচার—সে শাস্তি দেখে, সকলেই শিক্ষা করুক—ধর্ম্মের বিচার ব্রহ্মাণ্ডের সব বিচারের সেরা বিচার। তার গতি অতি সূক্ষ্ম—অথচ সর্ব্ব-প্রত্যক্ষদর্শী।"

"আর যদি তুমি তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে এ কাজে হাত দিয়ে থাক, তাহ'লে তোমার ধর্ম্মের ভাণ জগতের সমক্ষে যে তোমাকে ধার্ম্মিক ব'লে প্রমাণ করবে না, তার প্রমাণ?"

"পিতৃ-মাতৃ শোণিত। সঙ্গদোষে যেটা আজ করতে সাহস করেছি, সেটা আমারই উপার্জ্জিত। কিন্তু, আমার জন্ম—আমার জাতি—আমার বংশ—আমার অনায়ত্ত। স্বেচ্ছায় উপার্জ্জিত দুষ্ট বুদ্ধির সঙ্গে তার কোন সংস্রবই নাই। আমার প্রাক্তন, সুকৃতি দুষ্কৃতি আজ আমায় যে অবস্থায় ফেলেছে, তাতেও যদি আমার পরিবর্ত্তন না হয়, তাহ'লে আমার মৃত্যুই মঙ্গল। ঐ পত্র আর আপনার ইঙ্গিত এক হ'য়ে আইনের মুখে ফেলে আমাকে একেবারে ধ্বংসের মুখে পাঠাতে পারে। এখানে আস্‌বার আগে মোটেই আমার সে ধারণা হয় নাই। কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি, আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ধর্ম্ম যাকে রক্ষা করে, তাকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। আজ আপনার ক্ষমায়—আপনার দয়ায় আমার

চিরদিনের অভ্যস্ত কুবুদ্ধি যদি সুবুদ্ধিতে পরিণত না হয়, তাহ'লে আর আমার কোনও গতি নাই।"

"তুমি তোমার কাজের জন্য অনুতপ্ত ?"

"আমার মন এর পূর্ব্বে কখনও কোনও কাজে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। আজ প্রথম আত্মগ্লানিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ। এ আত্মগ্লানিই যদি অনুতাপ হয়, তবে আমি অনুতপ্ত।"

"কি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলে ? কার প্ররোচনায় এসেছিলে ? এ চিঠি কার ?"

"এর বিস্তৃত বিবরণ আমি আপনাকে আদ্যোপান্ত বুঝিয়ে শোনাতে চাই। এর মধ্যে আমার যতটুকু ধৃষ্টতা হবে, তার জন্যও আমি পূর্ব্বেই ক্ষমা চেয়ে রাখ্‌ছি।—

"আমার পনের বছর বয়সের সময় মা বাপ দুই-ই মারা যান। সম্পূর্ণ অভিভাবকশূন্য অবস্থায় আমি কল্‌কাতায় পড়বার জন্যে যাই। এফ্-এ পাশ করার পরই, সঙ্গদোষে, আমি উচ্ছৃঙ্খলতার পথে প্রথম পাদক্ষেপের পূর্ব্বেই, কিছুদিনের জন্যে কল্‌কাতা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হই। তখনও আমার মনের জোর একেবারে নষ্ট হয় নাই। এ রকম অবস্থায় মানুষে একভাবে চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পারে কি না তা ভগবান্‌ই জানেন।

"কিছুদিন মনের সঙ্গে লড়াই কর্‌বার পর, আমি দেশেই বিবাহ করি। আমার পৈতৃক জমীজমা, আর সুখ্যাতির সঙ্গে এফ্-এ পাশের খ্যাতি আমাকে খুব বড়লোকেরই জামাই ক'রে দেয়। বিবাহের পর আমার শ্বশুর মহাশয়ের অনুগ্রহে পুনরায় কল্‌কাতায় বি-এ পড়্‌বার জন্যে আসি। সেই সময় নয়-আনীর দেবনারায়ণবাবুর সঙ্গে কলেজের মধ্যেই আমার প্রথম আলাপ হয়।

সেই আলাপের ক্রমোন্নতিতে আজ আমার এই অবস্থা। দেবনারায়ণবাবুর একটা খুব বড় বদ্ অভ্যাস, যে দিকে তার ঝোঁক চাপে, তার চরম সীমায় না পৌঁছে ছাড়ে না। তাতে তার জীবন-মরণ একদিক—আর ইচ্ছা পূরণ অন্যদিক। এ রকম জেদী লোকের পাল্লায় পড়ে—মতে মত দিয়ে, আমার জীবনে আমি দু'টি ভয়ানক কাজ ক'রেছি। একটির পরিণাম—এক বড় বংশের কুমারী মেয়ের জীবনকে না সধবা—না বিধবা—না কুমারী এই অবস্থায় কাটাতে বাধ্য করেছি। আর একটি সম্ভ্রান্ত বংশের নিরীহ ভদ্রলোককে গোপনে রেখে, অতুল ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাকে কন্যা দান করাতে বাধ্য করতে, সিংহের গুহায় শৃগালের মত প্রবেশ করেছি। এখনও জানি না তার পরিণতি কোথায়!

"কলকাতায় বৌ-বাজারে, ধনপোতার হরনাথবাবুর বাড়ী। তাঁর একমাত্র উচ্চশিক্ষিতা কন্যার সঙ্গে দেবনারায়ণবাবুর বিবাহের প্রথম কথা হয়। আমি কখনও হরনাথবাবুর বাড়ীতে যাই নি। তাঁর পাটের আফিসে কর্ম্ম চেষ্টার জন্য প্রথম যাই। সেই সূত্রেই আমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হই। তাঁর আফিসে একটি বড় কাজও কিছুদিনের জন্য করি। দেবনারায়ণবাবু কখনও কখনও আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য পাটের আফিসে আসতেন। হরনাথবাবু আমার মুখে দেবনারায়ণবাবুর সমস্ত পরিচয় পেয়ে নিজের জামাতা করতে ইচ্ছা করেন। আমিই এ প্রস্তাবের সমর্থক হ'য়ে দেবনারায়ণবাবুকে কৌশলে হরনাথবাবুর বাড়ী পাঠাই। অবিবাহিতা কন্যার বিবাহের জন্য হরনাথবাবু এর পূর্ব্বে তাঁর এক বন্ধুকে তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে প্রথম

অনুরোধ করেন। তাঁর চিরদিনই ধারণা ছিল যে, বন্ধু সে অনুরোধ কখনও পূরণ না ক'রে থাক্‌তে পার্‌বেন না। কিন্তু দৈবচক্রে সেই অনুরোধের পর হ'তেই তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আর কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এই মনোক্ষোভেই, বন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী দেবনারায়ণের মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেই, কন্যা দান কর্‌তে তিনি দেশাচারের উপরেও কর্ত্তৃত্ব করেছিলেন। হরনাথবাবু প্রায়ই দেবনারায়ণবাবুকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতেন। এই সূত্রেই হরনাথবাবুর পরিবারবর্গের সঙ্গে দেবনারায়ণবাবুর ঘনিষ্ঠতা খুবই বেড়ে যায়। হরনাথবাবুর কন্যা মায়া কি মহামায়া বেথুন কলেজে পড়্‌তো। মায়ার পড়ার খুব আগ্রহ ছিল, এ কথা আমি হরনাথবাবুর নিকট মাঝে মাঝে শুন্‌তাম। দেবনারায়ণবাবু যখন বি-এ পাশ কর্‌লেন, সে সময় আমিই একদিন হরনাথবাবুর নিকট এই প্রস্তাব করি যে, বর কন্যা উভয়েই যখন শিক্ষিত, তখন এখন হ'তে সাম্‌না সাম্‌নি থাকায় দোষ কি? তাতে বরং মায়ার মন দেবনারায়ণবাবু নিজের মত ক'রে গড়ে তুল্‌তে পার্‌বেন। মায়ার সাম্‌নেই পরীক্ষা, তারও পড়ার বিশেষ সুবিধা হবে। তখন আর হরনাথবাবু তাঁকে অপর বাসায় থাকতে না দিয়ে, নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। মায়ার পড়ার সুবিধা হবে বলেই তিনি যেন এ প্রকার ব্যবস্থা কল্লেন। এর পূর্ব্বেই বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হ'য়েছিল।

"মায়ার পরীক্ষার পরই বিবাহ হ'বে, যখন এই প্রকার সমস্তই ঠিক হ'য়ে গেল, তখন ভাবী অভিভাবক ও উত্তরাধিকারী রূপেই দেবনারায়ণবাবু হরনাথবাবুর আফিসে কাজ কর্ম্ম শিখ্‌তে লাগ্‌লেন। এদিকে উদ্ধত যৌবনের সাম্‌নে দেববাবু ও মহামায়া

উভয়েরই প্রীতি বেশ বেড়ে উঠে, প্রেমে পরিণত হ'তে লাগ্‌ল। উভয়েই যে শিক্ষায় শিক্ষিত, তারই আদর্শ সাম্‌নে নিয়ে, আজ বায়স্কোপ - কাল থিয়েটার এই ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লেন। ভাবী দম্পতিযুগলের মনের অবস্থা যখন এই প্রকার, তখন তাঁরা সকলে একেবারেই ভুলে গেছলেন যে, আমিই তাদের এই সুদিনের— এই শুভ-মিলনের প্রথম হেতু। তাঁদের এই ভুল শুধ্‌রে দেবার জন্য, আর আমার নিকট চির কৃতজ্ঞ ক'রে রাখ্‌বার জন্য, আমার চোখে তখন যে শনির দৃষ্টি ফুটে বেরিয়েছিল, সেই তাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছিল। কার্য্যসূত্রে যতটা হ'য়ে গেল, ততটা আমার ইচ্ছে থাকে নাই। কিন্তু আমরা যে অপরিণামদর্শী। কাজেই, তাদের এই থিয়েটার, বায়স্কোপ ও নিত্য সান্ধ্য-ভ্রমণের একটু উচ্ছৃঙ্খলতা উভয়ের মধ্যেই এসেছিল। সেটা হরনাথবাবু প্রীতির চক্ষে দেখিলেও, দেশ, কাল এবং সমাজের ভয়ে, যতটুকু সাবধানে উচিত—সে আদর্শ কোনও প্রকারে নষ্ট করা উচিত হয় না বলে আমিই একদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। হরনাথবাবুও সরলতার উপর একদিন দেববাবুকে এই সব কথা ব'লেছিলেন। তার ফলে—দেববাবু একেবারে তাঁদের সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে দেশে চলে আসেন। দেববাবু চলে আসার পর হ'তেই, সেই সুখী পরিবারের মধ্যে এমন একটা বিষাদের কালিমা পড়ে গেল যে, তা আর মুছে ফেল্‌বার কোন উপায়ই করা গেল না। অতি অল্পদিনেই দেববাবু আফিসের কাজে খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। হরনাথবাবু গুণমুগ্ধ হ'য়েই আফিসের সব ভার দেববাবুর হাতে দিয়েছিলেন। বুদ্ধি বিবেচনায় এবং কার্য্য ক্ষমতায় তাঁর সমকক্ষ লোক খুবই কম দেখা যায়। তবে

অপরিণামদর্শিতার জন্য যখন যে খেয়াল তাঁর উপর কর্তৃত্ব ক'রে বসে, তখন তিনি সেই খেয়ালের বশে মানুষের বাইরে চলে যেতে দ্বিধা বোধ করেন না। যখন হরনাথবাবুর শরীর অত্যন্ত খারাপ, তখন আফিসে মোটেই আস্‌তে পার্‌তেন না। এমন সময় হঠাৎ দেববাবু চলে আসায়, আফিসের কাজ প্রায় বন্ধ হ'য়ে এসেছিল। তার উপর, আমাদের মত সব কটা হতভাগা একজোট হ'য়ে, হরনাথবাবুর কাঁচা পয়সা যে যত পার্‌ল লুটে নিয়ে দেশে গেল। আমিও তার মধ্যে একজন। বোধ হয় বা প্রধানই। দেশে এসে শুনি, দেববাবু এক জমীদারের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ কর্‌বার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন। দেশের অনেকে তাঁকে এ কাজ হ'তে নিরস্ত হ'তে অযাচিত উপদেশ দিয়ে বিশেষ লাঞ্ছিতও হয়েছে। এমন সময় হঠাৎ একদিন দেববাবুর সঙ্গে বর্দ্ধমানে আমার দেখা হয়। সেই সময় তিনি বলেন, আমিই তাঁর বিবাহের কথায় প্রথম ঘটকের কার্য্যে কৃতকার্য্য হ'তে না পারায়, আজও তিনি অবিবাহিত আছেন। সে জন্য এই বিবাহের—সদাশিব-বাবুর কন্যার সহিত দেববাবুর বিবাহের কথা পাকাপাকি ক'র্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টিত হতে অনুরোধ করেন। অবশ্য ছলে হ্উক, বলে হউক, কৌশলে হউক, এ বিবাহ দিতে পারিলে তিনি আমাকে হাজার টাকার সম্পত্তি দিবেন। সে সব লেখা পড়াও হয়ে গিয়েছে। নানা ব্যাপারে পড়ে, আর পুনঃ পুনঃ অন্যায়ের ত্রুটি সংশোধন কর্‌তে বাধ্য হ'য়ে, অধর্ম্মের বেনো জলে আমার ঘরো জল—পৈতৃক-সম্পত্তি সব ভেসে গেছে। এখন আমার কাচ্চা-বাচ্চা অনেকগুলি। তাই, অভাবের মুখে পড়ে, হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে, আপনার ক্ষমতার কথা শুনেও, এ কাজে হাত দিয়ে-

ছিলাম। আজ তার পরিণাম এই।" বলিয়া সেই পত্রবাহক আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুট ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

দেওয়ানজী বলিলেন—"প্রবল অনুতাপের পর কর্ম্মত্রুটি যদি পূরণ কর্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে পাপের ভার কতকটা নেমে যেতে পারে। একটা সুখী পরিবারের মধ্যে একবার ধূমকেতুর শক্তি জাগিয়ে, আর একটা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে এ ভাবে গোপন ক'রে রাখায়, কি যে অনিষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে, তা যদি বুঝ্‌তে, তাহ'লে আর এমন হ'বে কেন? যাক্, এখন যদি আইনের আশ্রয় নিয়ে দাঁড়ান যায়—তা হ'লে আমাদের কার্য্য এখনি উদ্ধার হ'বে; কিন্তু, তাতে আর একটা নূতন বিপদের সূত্রপাত করা হ'বে। সে বিপদের পরিণামে দেববাবুর কারাদণ্ড—আর হরনাথবাবুর কন্যার চিরজীবন অসার ক'রে তোলা হবে। জ্ঞানবাবু এখন কি পরামর্শ দেন?"

জ্ঞানবাবু বলিলেন—"সদাশিব এখন কোথায় আছে, কেমন আছে—এ কথা ত এখনও ঠিক জান্‌তে পারা গেল না।"

নবাগত বলিল—"বানের রাত্রে অন্ধকারে তাঁর নৌকা উল্টে যায়। এতেও যে দেববাবুর হাত থাকে নি, তা মনে কর্‌বেন না। তাতেই তিনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তাঁকে নয়-আনীতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান হয়। তাঁর সঙ্গের লোকটা, বরাবর নয়-আনীতে নিয়ে যাবার জন্য আপত্তি ক'রেছিল, এবং সদাশিববাবুকে সাত-আনীতে নিয়ে পৌছে দিতে অনুরোধ ক'রেছিল। সে লোকটার নাম বোধ হচ্ছে ভৈরব। সেও নৌকা হ'তে পড়ে যায় বটে, কিন্তু তত জখম হয় নি। যখন সে ক্ষেপে উঠে নয়-আনীতে সদাশিববাবুকে নিয়ে যাবার জন্য পথের মাঝে

সম্পূর্ণরূপে বাধা দিয়ে দাঁড়ালো, তখন একসঙ্গে দশজন লোকে তাকে ধরে রাখ্‌তে পারে নি। কিন্তু সেই সময় দেববাবু ও আমি এসে পড়ে তার উপর এমন নৃশংসের মত শক্তি জানিয়ে দিলুম যে, তাতেই ভৈরবের বাঁ হাতখানা একেবারে ভেঙ্গে যায়। মাসাবধি নয়-আনীতেই চিকিৎসাধীন ছিল। দিন কতক আগে আবার ক্ষেপে উঠে, সেখান হতে বার হ'য়ে আস্‌বার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছিল। তার সঙ্গে লড়াই ক'রে জন দশেক ভোজপুরী দরওয়ান একেবারে চির-জীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে,—কারও হাত, কারও পা, কারও চোক, কারও কাণ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। যখন এই ব্যাপার হ'তে থাকে, তখন রাত্রি বারটা-একটা। দেববাবুর লোক কোন গতিকেই তাকে ধরে রাখ্‌তে পারে না; সে বেরিয়ে পড়ে। শেষে দেববাবু এই সংবাদ জান্‌তে পেরে, তখনই ঘোড়া ছুটিয়ে এসে, নারায়ণপুরের সীমানায় তাকে গুলি করেন। কিন্তু সে লোকটার অদ্ভুত ক্ষমতা ও বুদ্ধিতে সে জীবনে নষ্ট হয় নি। এখনও বেঁচে আছে,—বর্দ্ধমান রাজ-হাঁস-পাতালেই আছে। তবে তাকে ডাকাতের দলভুক্ত ব'লে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সদাশিববাবুকে বিশেষ যত্নেই নয়-আনীতে রাখা হয়েছে। কোন্ বাড়ীতে যে কখন তাঁকে রাখা হচ্ছে, তা দেববাবুই জানেন, আর কেউ জানেন না। তবে তাঁকে খুবই যত্নে রাখা হয়েছে। আর তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য দেববাবু নিজে হাতে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা কর্‌ছেন, এটা আমি জানি। সদাশিববাবুর চিকিৎসার জন্য কল্‌কাতা হ'তে ডাক্তার আস্‌ছেন। তবে তাঁদের টাকা দিয়ে এমন ভাবে দেববাবু বাধ্য করেছেন যে, তাঁরা এ কথা কখনও কোনও লোকের কাছেই প্রকাশ কর্‌বেন না।

সোণার খাঁচায়—হীরের দাঁড়ে বসিয়ে, ঝরণার কাছে রেখে খাঁচার পাখীকে যতই আদর যত্ন করা যাক্ না কেন—তার মুখরোচক—যে সময়ে যা সে ভালবাসে—সবই দেওয়া হ'ক না কেন, সে তার উড়বার শক্তি হারিয়েও যেমন প্রকৃতির রাজ্যে আস্‌তে চেষ্টা করে, আর নিজের বিষাদ-সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে কাঁদে, তেমনই অবস্থায় সদাশিববাবু পড়েছেন। ডাক্তারদের দিয়ে তাঁকে মাঝে মাঝে শোনান হচ্ছে 'এ অবস্থায় যেন কোন মতে স্থানান্তরিত করা না হয়। তাহ'লে আর জীবনের আশা থাক্‌বে না।' ছলে, বলে যে তাঁকে এমন ভাবে আট্‌কে রাখা হয়েছে—তা তিনি এখনও বুঝ্‌তে পারেন নি। তাই তিনি দেববাবুর উপর অসন্তুষ্টও হন নাই। প্রতিদিনই তাঁকে এখানকার সংবাদ যথাযথ জানান হয়েছে, আর আমিই সে সংবাদও এখান থেকে বহন করে নিয়ে গেছি। এই সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমি কখনও প্রজা, ফেরিওয়ালা, ফকীর, নাগা, সাধারণ সন্ন্যাসী, বৈরাগী, কাবুলী, জ্যোতিষি পর্য্যন্ত হয়েছি।

"তাঁকে আরও একটা মর্ম্মান্তিক কৃত্রিম সংবাদে একপ্রকার অভিভূত ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছে। সাত-আনীর জ্ঞানবাবুর ছেলে প্রণবকৃষ্ণ চরিত্রহীন। তিনি একথা কোনও প্রকারেই বিশ্বাস করেন নাই। এখনও যে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে এমন কতকগুলো প্রমাণ প্রয়োগ তাঁর সাম্‌নে দাঁড় করান হয়েছিল, যাতে ক'রে মানুষ মাত্রেরই একটা ভুল ধারণা না হয়ে থাক্‌তে পারে না। একদিন একটা প্রজাকে শিখিয়ে আনা হ'ল, সে যেন দেববাবুর নিকট এই বলে বিচার প্রার্থনা করছে, যে, তাঁর একমাত্র সুন্দরী বিধবা কন্যার উপর

প্রণববাবু অত্যাচার ক'র্‌তে এসেছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় কোন মতে এবার তার ধর্ম্ম রক্ষা হয়েছে বটে, কিন্তু বড় লোকের কুৎসিত দৃষ্টি হ'তে কতক্ষণ নিজেদের রক্ষা করা যেতে পারে ? এর বিচার না করলে সে দেশত্যাগী হ'তে বাধ্য হবে। আবার কোন দিন বা আরও ভীষণ কল্পনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে, প্রণববাবুর উপর বিদ্বেষ সৃষ্টি কর্‌বার জন্য সদাশিববাবুর সাম্‌নে দাঁড় করান হ'ত। যখন এ সবের বিচার হ'ত, তখন যে সদাশিববাবুকে জানিয়ে-শুনিয়ে হ'ত, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই সব নানা কারণে তাঁর মন দুশ্চিন্তায় জীবন্মৃত হ'য়ে আছে যে, তা আর মুখে বলা যায় না। এদিকে যেমন প্রণববাবুর নিন্দায় তাঁর কাণ ভারি করে দেওয়া হ'ত, তেমনি অপরদিকে দান খয়রাত ক'রে সৎকার্য্যে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে দেববাবু প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁকে গুণমুগ্ধ ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌চেন। সদাশিববাবুকে নিজের মহত্ত্ব দেখাবার জন্য বাস্তবিকই দেববাবু অনেক ভাল কাজও করেছেন। এই বানের সময় তিনি সদাব্রত খুলে দিয়েছিলেন।

আবার, আপনার সহায়তায় ও আদর্শে স্বেচ্ছাসেবকগণের মহাপ্রাণতার সঙ্গে মিশে প্রণববাবু প্রভৃতি যে কাজ করেছেন, সে সংবাদ বাঙ্গালার প্রত্যেক সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। যেদিন সদাশিববাবু সে সংবাদ প্রত্যেক সংবাদপত্রের মধ্যে দেখ্‌লেন, সেদিন সকলকেই ডেকে ডেকে তিনি শুনিয়েছিলেন, আর আনন্দে যেন নেচে উঠেছিলেন। সে রকম আনন্দিত হ'তে এর আগে আমি আর কাকেও কখনও দেখি নাই। এই পত্রখানা একজন লোককে দিয়ে লিখিয়ে এখানে আনা হয়েছে। এর আগা-গোড়াই কৃত্রিম। মায়ার মন পরীক্ষা করাই এ পত্রের

উদ্দেশ্য। কিন্তু, মানুষে যা মনে করে, সব সময় তা ভগবান হ'তে দেন না। দিলে বোধ হয় মানুষে মনে কর্‌তো যে, তারাই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্।"

১৭

অস্তগত সূর্য্যের সোণালি আভাময় রক্তরাগে পশ্চিম আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার আকাশে সাদা-সাদা মেঘের শ্রেণী মৃদু-বাতাসের সঙ্গে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হাওয়ার তেজ না থাকাতে চারিদিকের জড় প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা দিনের রৌদ্র-তাপে দগ্ধ ছাদের উপর দেওয়ানজী প্রকৃতির এই ভাবের সঙ্গে মিশিয়াই গাঢ় চিন্তায় মগ্ন। কপালে বিন্দু-বিন্দু স্বেদজল দেখা দিয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে মহামায়া ছাদে আসিয়া বলিল, "জেঠামশাই! আহ্নিকের আসন এখানেই দেব কি ?"

"না মা, পূজার ঘরেই আজ থেকে আহ্নিক কর্‌বো। এখন ত একটু বল পেয়েছি। চলাবুলো একটু আবার অভ্যাস করা যাক্, দু'দিন পরে সবই ত হাতে তুলে নিতে হ'বে। বসিয়ে কে খেতে দেবে মা!"

"জেঠামশাই, সারা জীবনটা খেটেও কি আপনার বসে খাবার সংস্থান হয়নি ?"

"নিছক বসে কি মানুষ খেতে পারে মা! শরীর মন একটা না একটা নিয়ে থাক্‌বেই। হাতে কিছু কাজ যদি না থাকে, তবে মনের মাঝে তখন মহা বিপ্লব বেধে উঠ্‌বেই। এটা হচ্ছে আমাদের শরীর মনের চিরদিনের সংস্কার বা অভ্যাস। মনকে নিষ্ক্রিয়

করতে পারলেই সব শেষ হয়ে যাবে মা! তা হয় কই। তাইতে মা বসে খাওয়া চলে না। সে সংস্থান যার হয়েছে, সে যে জীবন-মুক্ত হয়ে গেছে মা! বসে খাওয়া সংসারের মধ্যে হতে পারে কি? যতক্ষণ আমার নিজের সুখ-দুঃখ বুঝতে পারছি, ততক্ষণ আমাকে কর্ত্তব্যের খাতিরে সর্ব্বসাধারণের সুখ-দুঃখ, অভাব অভিযোগ মেনে চলতে হবে। নিজের অভাব পূরণ করতে সমস্ত শক্তিকে যেমন ক'রে কাজে লাগাতে হয়, তেমনই ত মা অপরের জন্য কর্ত্তে হবে। তা না হ'লে, আমাদের যিনি সৃষ্টির সেরা জীব ক'রে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করা হবে মা! কর্ত্তব্যের মাহাত্ম্য বাড়াতেই তিনি পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়েও, নিজে এই কর্ম্মভূমিতে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে এক এক যুগে এক এক অবতার হ'য়ে আদর্শ কর্ম্ম ক'রে গেছেন। আদি যুগ হ'তে মানুষ নিজেদের কর্ম্মের ভুলে যে সব অত্যাচার গড়ে তোলে, তারই শক্তি যখন সারা বিশ্বের উপর ছড়িয়ে পড়ে—সব নাশ করতে উদ্যত হয়, তখন তিনি আর না এসে থাকতে পারেন না। তাই আমাদের উচিত হচ্ছে, নিজের নিজের কর্ম্মের মধ্যে কোন গ্লানির সৃষ্টি না করা। এর জন্যই আমাদের ধর্ম্মের শাসন—সমাজ শাসন, দেশাচার, লোকাচার প্রভৃতি মেনে চলতে হবে। তা না চলতে পার, পাপের বোঝা মাথায় ক'রে, জন্ম-জন্মান্তর ইচ্ছাসুখে ঘুরে-ঘুরে মর। সারাজীবন যে কাজ করেছি, তারই পরীক্ষা দিতে এবার আমাকে এই শেষ জীবনে নূতন ক'রে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। এখানে মুখের পরীক্ষা চলে না মা, কাজের সাফল্যে পরীক্ষা দিতে হবে। আবার শোন, যদি সে ফলের আকাঙ্ক্ষা নিজে কর, তবে তোমার সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। সাফল্যের শেষ তৃপ্তি তোমাকে

ভগবানের নামে অর্পণ কর্‌তে হবে। এ বড় কঠিন অথচ সরল পথ মা! মনে-প্রাণে এক করে চল—কোথাও গোল নেই দেখ্‌বে। আর যদি ঐ দুটো জিনিস্ দুদিকে চলে—তবেই বিপদ। এই যেমন ধর মিথ্যে ব্যবহার খুব কঠিন, কেন না, তার আগুপিছু অনেক হিসেব রেখে চল্‌তে হবে। এক মিথ্যা হতে সহস্র মিথ্যা প্রসব কর্‌বেই—তার জন্য তোমাকে সব সময়েই তৈরী থাক্‌তে হবে। আর দেখ, সত্যের ব্যবহার কত সরল, তার হিসাব নেই—সে সব সময়েই এক। সবদিকেই সরল। সে যেন পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ-রহিত, অথচ পূর্ণ সমবায়-সূত্রে বদ্ধ। এই দেখ মা, দেবনারায়ণ কত বড় মিথ্যার জাল তৈরী কর্‌তে, কত মিথ্যের সৃষ্টি ক'রে বসেছে। আর এখানে সত্যের বাতাসে কেমন ছিঁড়ে যাচ্ছে। ছেলেমানুষ সব পরিণাম ভেবে দেখ্‌তে জানে না। পরিণাম ভেবে কেন—এক একটা কার্য্যের পরিণতি দেখেও সাবধান হয় না। এত বড় মাথাটা মন্দ দিকে চালিয়ে ঝোঁকের উপর চলেছে। এত বড় শক্তির অপব্যয় কর্‌তে দেখে কি চুপ ক'রে থাকা যায় মা? যাদের অন্নে সারা জীবনটা আনন্দের সঙ্গে কাটান গেল—আজ তাদের এ-সব কি বিপদ বল দেখি। এক সঙ্গে চারটা বড় বাড়ী, বড় বংশ নষ্ট হয়ে যাবে—আর চুপ ক'রে তাই বসে দেখা যায় কি মা! যা হবার তা হবেই, তবুও আমাদের কর্ত্তব্যের খাতিরে একবার পুরুষকারকে খাটিয়ে নিতে হবে বৈ কি। দেখা যাক্, শেষ কি হ'য়ে দাড়ায়।"

"এই অসুখ শরীরে আর আপনার কোন ব্যাপারে গিয়ে কাজ নেই। যা হয় হ'ক্। মামাবাবুকে পাঠিয়ে দিন, তিনি পুলিসের সাহায্য নিয়ে কাকামশায়কে সেখান হ'তে নিয়ে আসুন।"

"যতটা সহজ মনে কচ্ছ মা, তা নয়। যখন এই লোকই জানে না যে, সদাশিববাবু কোথায় কখন থাকেন, তখন পুলিসের চোখে যে ধূলো দিতে পারবে না, এ ধারণা করো না। ধন, প্রভুত্ব, যৌবন, আর অবিবেকতা—চারটা একসঙ্গে জুটে যে অনর্থ কচ্ছে, তাদের মন্দশক্তির প্রথম আবেগে সবই ভেসে যাবে। এদের সব সুপথে ফেরাতে হলে, বেশ চতুরতা আবশ্যক, যাকে বলে, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। পুলিসের হাতে দিলে হয় ত কার্য্যোদ্ধার হবে। সেখানের নির্ম্মম বিচারে ক্ষমা নেই। বিচারের হাতে পড়ে অপরাধের শাস্তি হওয়াই সব ক্ষেত্রে সমান ভাবে উচিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অপরাধের ক্ষমায় জীবনটা নূতন পথে এনে এত ভাল করে গড়ে নেওয়া যায় যে, অপর কিছুতে তা হয় না। আর তাদের মত লোকের কাছে থেকে অনেক ভাল কাজ সহজে আদায় করে নেওয়া যায়। ক্ষমা করতে যতদিন না পারবে মা, ততদিন মনের মধ্যে ময়লা বাড়তে থাকবে। মনের তেজে খুব বড় হয়ে থেকো, কোন শক্তির কখনও অপচয় করো না। কিন্তু ভুলের ক্ষমা করাটা যেন স্বভাবের সঙ্গে মিশে থাকে, তা না হলে আমাদের মনুষ্যত্বটা এক প্রতিহিংসার ছবি হয়ে দাঁড়াবে। যিনি যত বড়, যার শক্তি যত বেশী, তাঁর ক্ষমাগুণ তত বেশী। পৃথিবীর নিকট সহ্যগুণ আর বশিষ্ঠের নিকট ক্ষমাগুণ শিখতে হয় মা! শত পুত্রের বিনাশেও বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা করতে কাতর হননি। অথচ, তেত্রিশ কোটী দেবতায় বিশ্বামিত্রকে যা দিতে পারেননি, সেই শক্তিই— সেই ব্রহ্মণ্য শক্তিই বশিষ্ঠই দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের তেজ যেমন প্রকৃতিদত্ত, তেমনই ক্ষমাগুণও স্বাভাবিক। অভিমানে তার

অমর্য্যাদা করে, কেন মা নিজের পথ হতে দূরে চলে যাব। মা, ছেলের কাছে মনের কোন কথাই চেপে রেখ না। তোমারই কথার উপর সব নির্ভর করছে। তোমারই মুখ চেয়ে তার সব দোষ আমি ক্ষমা করছি। এখন তুমি তোমার কর্ত্তব্য ঠিক করে নাও মা। তুমি যদি মনে-প্রাণে এক করে তাকে ক্ষমা করতে না পার, তাহ'লে তোমার নারীজীবনটা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। একদিনের জন্যও কি তাকে তুমি স্বামী বলে ভাব নি?

কুমারী-জীবনে, পিতামাতার আদেশে-ইঙ্গিতে, শুভ কি অশুভ মুহূর্ত্তে, মনের মধ্যে যাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া লইয়াছে, আজ সে কি করিয়া বলিবে যে, এমন লোককে সে তাহার জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া লইয়া সংসারের পথে চলিতে পারিবে না।

সে একথা কখনও ভাবে নাই যে, এমন প্রশ্ন তাহার উপর কেহ কখনও করিবে। যতদিন সে দেবনারায়ণের সাহচর্য্যে ছিল, কখনও ভাবে নাই যে, এরূপ একটা প্রতিবন্ধকতা তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইতে পারিবে। যেদিন সে শুনিয়াছে 'ইনিই তোমার ভাবী স্বামী'—সেই দিন হইতে সে তাহার কায়, মন, বাক্য ও ব্যবহারকে তাহারই অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। সে বিশিষ্ট শিক্ষিতা বলিয়াই নিজেকে জানে, এবং সকলেই একথা তাহাকে এতদিন ধরিয়া বলিয়া আসিতেছে। তাহার সারাজীবনে সে উচ্চ শিক্ষার এরূপ পরীক্ষার ক্ষেত্রে কখনও পড়ে নাই। আজ এই বৃদ্ধ, যাহাকে সে বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাইতেও কুণ্ঠিত নহে, তাহার নিকট কি পরীক্ষা দিবে। এ যে তাহার জীবন-মরণের মধ্যে অতি ভীষণ অগ্নি পরীক্ষার প্রথম সূচনা। এ কথা সে অনেকবার নিজের মনে বিচার করিয়া দেখিলেও,

অপরের সমক্ষে সে কথা বলে কি করিয়া? সে যে কত ক্ষেত্রে নারীর মহিমময়ী চরিত্র দেখিয়া নিজের নারীজন্মকে ধন্য মনে করিয়াছে। পুরাণে, কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে এইরূপ কত নারীর সমস্যাময় জীবন দেখিয়াছে, আর তাহাদের জীবনের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, নিজের জীবন ও কর্ম্ম মিলাইয়া লইতে, এই কয়মাস ধরিয়া কত চেষ্টা করিয়াছে। বিশেষ সতীকুলরাণী সাবিত্রী চরিত্রে যাহা দেখিয়াছে, তাহাই মনের মধ্যে অতি পবিত্রতার সহিত আঁকিয়া লইয়াছে। সকল প্রলোভনকে পায়ে ঠেলিয়া নিজের নারী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, জীবনপাত করিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে; তাই মায়ের শত উপরোধ, অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চিরদিনের জন্য কলিকাতার মায়া ত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়াছে। সেই যে একদিন মায়ের মুখের উপর বলিয়াছিল, 'বিবাহের মন্ত্র কয়টা পড়া হয় নাই বলিয়াই কি আমার মনের দাগ মুছিয়া দিতে পারিবে।' সতীর গর্ভে জন্মিয়া সে এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবে কেন? এমনই সমস্যাময় প্রশ্নের মধ্যে পড়িয়া, সভার মধ্যে পিতার প্রশ্নের উত্তরে সতী-শিরোমণি সাবিত্রী একদিন বলিয়াছিলেন—

"পিতঃ—

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা;
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং সে মনস্ততঃ॥

[সাবিত্রী কহিয়াছিলেন, 'দ্রব্যের অংশ একবারমাত্র নিপতিত হয় ; কন্যাকে একবার মাত্র দান করে ; দিলাম এ বাক্য একবারই বলে। হে পিতঃ, এই তিন কার্য্য এক একবারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব তিনি দীর্ঘায়ুই হউন, অথবা অল্পায়ুই হউন,—সগুণই হউন বা নিগুর্ণই হউন,—আমি যখন একবার তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি। আমি কদাপি আর কাহাকেও বরণ করিব না। দেখুন, কর্ম্ম প্রথম মন দ্বারা নিশ্চিত, তৎপর বাক্যদ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয় ; অতএব আমার মতে মনই প্রমাণ']।"

সেও ত সেই আর্য্যকুলে সেই আর্য্য শোণিতে—সতীর গর্ভে জন্মিয়াছে, সেও কেন না উচ্চকণ্ঠে ঐ কথাই প্রতিধ্বনি করিবে ? যেখানে ধর্ম্ম লইয়া কথা—সেখানে কেন সে সঙ্কোচ করিয়া, নিজের জীবনকে একেবারে হীন করিয়া, রসাতলে পাঠাইবে ? মনের মধ্যে শত সহস্র শক্তিকে জাগাইয়া সেও বলিয়া উঠিল—"স্বামী বলে মনের মধ্যে ভেবেছিলাম বলেই, আজ একথা বল্‌তে পার্‌ছি ; নতুবা, এ সম্বন্ধে আমার কোন কথা বলা সঙ্গত হ'ত না জেঠামশায়। স্বামীই নারীর দেবতা ; কিন্তু দেবতারও দেবতা আছেন। তিনি—যে তাঁর পায়ে অপরাধ করে—তাঁকে ভুলে থাক্‌বেন, এটা আমি স্ত্রী হ'য়ে দেখ্‌তে চাই না। তা আমি বলি, যাতে এত বড় ভুল ভেঙ্গে যায়, যাতে দেবতার নির্ম্মাল্যের মত তাঁর মন ও চরিত্র পবিত্র হয়, তার উপায় আমাদের কর্‌তেই হ'বে। তাতে আমার এ জীবন কেন—দু'চার জন্মও যদি ব্যর্থ হয়ে যায় ত যাবে! এ ত এই জন্মেই শেষ হ'য়ে যায় না,—যেতে পারে না।"

১৮

নারায়ণপুরের খাজনা রাজবাড়ীতে দিবার জন্য জ্ঞানবাবু প্রণবকৃষ্ণকে পত্র দেন। আর সাত-আনীর খাজনাও যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত দেওয়া হয়, সে কথাও লিখিয়া দেন। প্রণবকৃষ্ণ যথাসময়ে পত্র পাইয়া, রাজবাড়ীতে খাজনা দিয়া তাহার রসিদ নারায়ণপুরে পাঠাইয়াছেন। যেদিন সেই রসিদখানি লইয়া লোক আসিল, সেদিন জ্ঞানবাবু দেওয়ানজীকে রসিদখানি দিয়া বলিলেন —"রাজবাড়ীর খাজনার রসিদ দপ্তরেই জমা করিয়ে দিই।"

দেওয়ানজী বলিলেন—"না, এ কথা এখন কাকেও জানিয়ে কাজ নেই। ওটা আপনার নিকট রেখে দিন। পরে টাকা দিয়ে ওটা নেওয়া যাবে। আর দেখাই যাক্ না, দেববাবুর কত দৌড়? তিনিও ত খাজনা দেবেন বলে একটা চাল চেলে রেখেছেন। আমার মনে হচ্চে, দেববাবুর নিজের মহলের টাকা এবারে সব যোগাড় হয়ে উঠ্‌বে না। তাঁর দিকেও ত বানের জলে সব পচে গেছে। প্রজারা খাজনা দেবে কোথা থেকে? তাঁর নগদ টাকায় এখন হাত দেবার ক্ষমতা নেই। চল্লিশ বৎসর বয়সের পরে তাঁর সে টাকায় হাত দেবার ক্ষমতা আস্‌বে বলে, তাঁর পিতাঠাকুর উইল করে গেছেন। স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট আমি একথা শুনেছিলাম। তিনিও তাতে সাক্ষী ছিলেন। যা কিছু হাতে ছিল, তাতেই সদাশিববাবুর মন কিন্‌তে খুব দান খয়রাৎ করেছে। এখন যা আছে, তাতে এ রকম বাবুয়ানায় বেশী দিন যাবে না বলেই মনে হচ্ছে। যাক্, নয়-আনীর মহলের জন্য তত ভাবনার কোনও কারণ নেই। মহামায়ার

মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে, ওটা মহামায়ার নামেই কিনে রাখলেই হবে। তবে এ সংবাদ কোন প্রকারে দেববাবু জান্‌তে না পারেন যে, মহামায়া তাই কিনে নিয়েছে। যদি কোনরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে যেন মায়াই কিনেছে, এমনই সংবাদ সাধারণে জান্‌তে পারে। একবার এমন করেই দেখা যাক্, তাকে ঠিক পথে আন্‌তে পারা যায় কি না।"

"এত বড় ব্যাপারে কি সে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌বে ?"

"না থাকাই উচিত। তবে যে রকম খবর পাচ্ছি, তাতে তাঁর উপর এখন শনির দৃষ্টি পড়েছে,—এতে কোন ভুল নাই। এই সঙ্কট সময়ে তিনি সব পুরানো লোকদের জবাব দিয়ে, নূতন লোক বাহাল ক'রেছেন। তাও আবার কেমন সব লোক পছন্দ হয়েছে জানেন, যাঁরা কখনও এ কাজ করেন নি, আর যারা তাঁর তোষামোদকারী বাল্যবন্ধু। এই শুন্‌তে পাচ্চি, তাঁর মহলের মধ্যে খুব অত্যাচার হওয়াতে প্রজারা সব ক্ষেপে উঠেছে,—তারা একজোট হয়ে পূজার মুখেই খাজনা বন্ধ করে দেবে! কতক জায়গায় খাজনা দেবার মত প্রজাদের অবস্থা নাই। অত্যাচার কমাতে, দেবনারায়ণকে সুপথে আন্‌তেই, ভগবান্ সব এমন করে তুল্‌ছেন, তাতে আর কোন সন্দেহই নাই।"

"এ দিকের ব্যবস্থা এরূপ হলেও ত সদাশিবের উদ্ধারের উপায় হ'ল না। বড় বিপদ হ'ল। নিজেদের সামর্থ্যেও কুলান হচ্ছে না, অথচ, রাজার সাহায্যও নেবার উপায় নাই; তাহ'লেই আর একটা জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কি যে করা যায়, বুঝে উঠা দায়। কি হবে, কেমন করে সদাশিবকে উদ্ধার করা যাবে! আমি যেন ক্রমশঃ হতাশ হ'য়ে পড়ছি।"

"মায়া কি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেছে ?"

"বলে নি, কিন্তু এই ক'দিনে সে যেন আধখানা হয়ে গেছে। মুখ চোখ বসে গেছে। মাথার একরাশ চুল রুক্ষ হয়ে যেন তার মনের মতই উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সব সময়েই মনে হচ্ছে যেন, এখুনি কাঁদ্ছিল। কথাবার্ত্তা একদম বন্ধ করে, সর্ব্বদা গুম্ হয়ে বসে, আকাশ পাতাল কি যেন ভাব্ছে। আমাদের সাড়া পেয়েই চম্কে উঠ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, যেন সে আমাদের দেখাতে চায়, তার কোনও দুঃখ হয় নাই।"

"জ্ঞানবাবু, আপনি কেঁদে ফেল্লেন যে! আসুন, আসুন, —এখনি এরা এসে পড়বে। হয় ত আরও একটা অশুভ ঘটনা হয়েছে মনে করে—চীৎকার করে উঠ্বে। মায়া যে এখনও চুপ করে আছে, সেই আমাদের খুব ভাগ্যি। সে আমার সাম্নে আর সেদিন হ'তে আসে নি। আমি মায়ার মন বোঝবার জন্যই বলে দিয়েছি, এই পত্রখানার একটা উত্তর দিতে হবে। সে দু'দিন সময় চেয়ে মহামায়াকে দিয়ে বলেছে—'সব পাগলের খেয়াল মিটাইবার মত আমার মনের অবস্থা নাই। তবে, বাবার পত্রের উত্তর না দিলে দোষ হবে; তাঁর প্রতি অমর্য্যাদা করা হবে বলেই, আমি একটা উত্তর দিব।' দেখা যাক্ কি লিখে, আমার বুকের বোঝাটা মা নামিয়ে দেন। আজই পত্র নিয়ে লোক যাবার কথা আছে।"

"কে যাবে ?"

"যে লোকটা এসেছিল, তার খুব জ্বর হয়ে পড়ে আছে। তা ছাড়া, তাকে এখন কিছুদিন এই বাড়ীর মধ্যে নজরবন্দী করে রাখ্তে হবে; তাই অপর লোক দিয়ে পাঠাব। একজন

জমীদারের বাড়ী হতে অপর জমীদারের বাড়ী পত্র যাবে ;— বিশেষ, বাপের চিঠির উত্তর পাঠাচ্ছে মেয়ে, তাতে ত কোন অভিসন্ধি থাক্‌তে পারে না। তবে, যে পত্র দিচ্ছে, তার মত নিয়েই এ ব্যবস্থা করা যাবে। দেখা যাক্, সেই বা কি বলে।” এই বলিয়া দেওয়ানজী “মায়া,—মায়া, ও মায়ি,” বলিয়া বার কতক ডাকিতেই, স্বল্পাভরণা, শুভ্রবসনা, ঈষৎ ক্ষীণাঙ্গী, কৈশোর-যৌবনের মধ্যবর্ত্তিনী মায়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, শঙ্কা, কুণ্ঠা, দ্বিধা বা দৈন্যের মালিন্য-শূন্য দেবীমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। দেওয়ানজী সাম্‌নের একটা কাগজের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, যেন মায়াকে দেখেন নাই এমনি ভাবে মায়ার দিকে অন্যমনস্কের মত হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—“তোমার বাপের চিঠির উত্তরটা দাও ত মা! সেটা আজই পাঠিয়ে দিই। পত্র পেতে যত দেরী হচ্ছে, তিনি তত ভাব্‌ছেন। সে লোকটার জ্বর হয়ে পড়েছে, কাকেই বা পাঠান যায় বল দেখি মা?”

মায়া দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে নিঃসঙ্কোচে বলিল—“পত্রখানা ওঘরে আছে, আন্‌ছি।”

পাশের ঘর হইতে একখানি খামে-পোরা পত্র আনিয়া দেওয়ানজীর হাতে দিয়া বলিল—“জেঠামশাই, আপনারা এ পত্র-খানা দেখে দেবেন। যদি সব কথায় উত্তর দেওয়া না হয়ে থাকে, বা কিছু ভুল হয়ে থাকে।”

“আচ্ছা মা, আমরা দেখে দেবো। কিন্তু কার হাত দিয়ে পত্রখানা পাঠাই, বল দেখি মা?”

“এ কথা কেন বল্‌ছেন, বুঝ্‌তেই পার্‌ছি না। সেখান-

কার কোনও গোপন সংবাদ যদি আমাদের জান্‌তেই হয়, তবে সে ভার এ পত্রবাহকের উপর না দেওয়াই উচিত। আমার কাছ থেকে বাবার পত্রের উত্তর নিয়ে যাবে, তার মধ্যে কোনও ছল-চতুরতা থাকে, এ আমার মোটেই ইচ্ছে নয়। আমার মনে হয়, তাহ'লে বাবার অমর্য্যাদা করা হবে। দরওয়ান সঙ্গে নিয়ে, সরকার মশাই গিয়ে বাবার হাতে পত্রখানা দিয়ে আস্‌বেন। আমার চিঠি আমাদের লোক ভিন্ন অপর লোকের হাত দিয়ে বাবার হাতে পৌছে, এটা আমার ইচ্ছে নয়। আমার ইচ্ছে, বলাটা এ আমার খুবই ভুল হচ্ছে ; আপনারা যেমন ভাল বিবেচনা করেন, তাই করুন।” বলিয়া মায়া শুষ্ক মুখে হাসিবার বারেকমাত্র চেষ্টা করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দেওয়ানজী ও জ্ঞানবাবু পরস্পরে অনুরুদ্ধ হইয়া এক একবার পত্রখানি পড়িলেন। পত্র পাঠান্তে জ্ঞানবাবু দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অশ্রু-প্রবাহ বৃদ্ধের দুই গণ্ড বাহিয়া, শ্বেত শ্মশ্রুর উপর দিয়া, পৃথিবীর তপ্ত বক্ষ যেন শীতল করিতে অতি দ্রুত নামিতেছে। সে সময় পত্রের কথা আলোচনা করিবার শত ইচ্ছা মনের মধ্যে দমন করিয়া, জ্ঞানবাবু দেওয়ানজীকে যেন অন্যমনা করিবার জন্য, মায়ার ইঙ্গিতমত নয়-আনীতে পত্রখানি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে দেওয়ানজীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে দেওয়ানজীর আদেশ পাইয়া, পত্র লইয়া, সরকার মহাশয় একজন দরওয়ান সঙ্গে নয়-আনী চলিয়া গেলেন।

দেববাবুর অনুগ্রহে ও আতিথ্যে সরকার মহাশয় তৃপ্ত হইয়া,

সদাশিববাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মায়ার পত্র দিলেন। রোগশয্যাশায়ী সদাশিববাবু অসীম আগ্রহে তৎক্ষণাৎ সেই পত্রখানি পড়িয়া ফেলিলেন। পত্রপাঠ শেষ করিয়াও তিনি অপলক বিস্ফারিত চক্ষুতে স্তম্ভিতের ন্যায়, পত্রের উপর একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সদাশিববাবুর এরূপ উত্তেজনা দেখিয়া একজন ডাক্তার তখন সরকার মহাশয়কে বলিলেন—"অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা বা চিন্তা, কি বাক্যালাপ রোগীর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এখন আপনি বাহিরে যান।" কাজেই, সরকার মহাশয় মনের মধ্যে রোগীর সম্বন্ধে যাহাই ধারণা করিয়া লউন না কেন, চিকিৎসক-প্রবরের কথাই শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন, এবং দেববাবুর ইঙ্গিতে বাহিরে আসিলেন। কিন্তু তিনি বাহিরে আসিয়া শুনিতে পাইলেন, সদাশিব-বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতেছেন, "কার চোখে আর কত দিন ধূলো দেবে ডাক্তার। দেবনারায়ণের পয়সায় মনুষ্যত্বটা একেবারে মাটির দরে বেচে দিচ্ছ? দাও;—এর বিচার একদিন হবেই হবে। আর দেবনারায়ণ, তুমি এত বড় বংশের ছেলে হয়ে—এমন উচ্চ-শিক্ষিত হয়ে, এমন উচ্চ মন নিয়ে, কেবল সঙ্গ-দোষে সব ভাসিয়ে দিচ্ছ বাবা! আমার দেওয়া পত্র অন্যরূপ করে আমার মেয়ের কাছে পাঠিয়ে, তার মনে একটা মন্দের কাল ছবি এঁকে দিতে যাওয়ার সাহস তুমি কার কাছ থেকে পেয়েছ? আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে নিজের মানসম্ভ্রম সব পুড়িয়ে ফেল না; ছেলেমানুষ তুমি, জান না, এসব খেলবার জিনিস মনে ক'রো না। আমার মেয়ের অমর্য্যাদা কর্ত্তে প্রয়াস পেয়েছ বলে আজ আমি এ কথা তোমায় বলছি না। আমার বলা উচিত বলেই

বল্‌ছি। কখনও কোনও সময়ে নারীর মর্য্যাদার উপর হাত দিও না। বিশ্বের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, সব দোষের ক্ষমা আছে, কেবল এই সতীধর্ম্মের উপর তাচ্ছিল্যে যে পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত নেই—তার ক্ষমা নেই। মানুষ ত ছার, স্বয়ং ভগবান্‌কেও এই সতীর অভিসম্পাতে পশুর আকার ধর্‌তে হয়েছিল, আত্মবিস্মৃত হয়ে হাহাকার করে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। দেবতার দলকে ঘোড়ার ঘাস কাটিয়েও রাবণের বংশনাশ হয় নাই। কিন্তু সতীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে সাহসী হয়েই হয়েছিল। সীতাকে ছলে, বলে, কৌশলে যেমন লঙ্কায় এনেছিল, তেমনি সেই পাপের তাপেই সবংশে ভস্ম হয়ে গেল। দুর্য্যোধনেরও এই দশা। ব্রহ্মাকেও এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য নিজের জ্ঞানমুণ্ড শিবের হাতে বলি দিতে হয়েছিল। তাই পঞ্চমুণ্ড ব্রহ্মা অনন্ত-কালের জন্য চতুর্ব্বদন হয়ে গেছেন। দেবনারায়ণ, সাবধান হও—হয় ত এখনও সৎসঙ্গে তোমার ফের্‌বার উপায় হতে পারে; কিন্তু একবার যদি পাপের এই শেষ ধাপে পা দাও, তাহ'লে আর কোন উপায়ই থাক্‌বে না। একেবারে গড়িয়ে শেষ স্তরে নিয়ে, সব হারিয়ে বস্‌বে। এখানের সব কৃমিকীটের সঙ্গ ত্যাগ কর। যত সব নরাকারে পশু এখানে এসে একজোট হয়ে এত বড় একটা বনেদী বংশের ছেলেকে—বংশের শেষ সম্বলকে—পৈতৃক জল-পিণ্ডের প্রত্যাশার শেষ সম্বলকে একেবারে উচ্ছেদ করে দিতে বসেছে। কি ভয়ানক পরিণাম এর! ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, আমার একমাত্র কন্যা মায়া, সে আজ তার বাপকেও শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। তাঁর দয়ায় সে, যে মনের জোর নিয়ে আমায় পত্র দিয়েছে, এমনই মনের জোর তার যেন চিরদিন থাকে। শুধু

তার কেন, প্রত্যেক নারীর মধ্যে এমন শক্তি যেন বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হয়। নতুবা, এই উদ্ধত যুগের অসংযমী দলের মধ্যে আমাদের মায়ের জাতির সম্মান থাকে না যে মা। বিশ্বেশ্বরী মা আমার, আর একবার—এই ভারতের মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেববৃন্দের মুখ দিয়ে সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণমন-মাতান তোমার স্বরূপ স্তব শুনিয়ে দাও মা!—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিত-মম্বয়ৈতৎ, কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তি॥
সর্ব্বভূতাযদা দেবী স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

১৯

শত-বিলাস-সম্ভারে পরিপূর্ণ একটি হলঘরে প্রবেশ করিয়া দেবনারায়ণ বাবু দুইজন অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলেন, "আমি না ডাকা পর্য্যন্ত যেন কেহ আমাকে এখানে বিরক্ত করিতে না আসে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইলেও আমার এ আদেশের অন্যথা হইবে না। যিনি এ আদেশ অন্যথা করিতে সাহসী হইবেন, তিনি যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আসেন।"

দেবনারায়ণবাবুকে হয় ত অনেকে না জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অখণ্ড প্রতাপকে অনেকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছেন—যাদের সে সৌভাগ্য হয় নাই, তাঁরা অন্ততঃ শুনিয়াও স্তম্ভিত হইয়া আছেন। ধনগর্ব্বে উন্মত্ত দেবনারায়ণবাবু দেশে আসিয়া

অবধি যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়া নিজের আধিপত্যের উপর কঠোর শাসন-পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে লোকে ভীত, স্তম্ভিত, সন্ত্রস্ত হইয়া, কোন গতিকে মনপ্রাণ বাঁচাইয়া, বহু-কালের পৈতৃক বাস্তুর মায়া কাটাইতে না পারিয়া, অর্দ্ধমৃত হইয়া আছেন মাত্র। অবশেষে উৎপীড়িত প্রজারা একজোট হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়া আশ্বিন কিস্তির খাজনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আর সময় নাই, কালই খাজনা রাজবাড়ীতে পাঠাইতে হইবে, নতুবা সব নীলামে চড়িবে। ঘড়ি পিটিয়া এক—দুই—তিন ডাকিয়াই সে ডাক একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। কাহার ভাগ্যলক্ষ্মী তখন কাহাকে আশ্রয় করিবেন, তাহা কে জানে? এই ভাবনা না ভাবিয়া—ইহার প্রতিকার না করিয়া, রূপমুগ্ধ মন লইয়া সদাশিববাবুর কন্যার পত্রখানা গোপনে আত্মসাৎ করিয়া আনিয়া, সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিয়া, দেবনারায়ণ একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া, পড়িতে লাগিলেন,—

শ্রীশ্রীকালীমাতা সহায়।

শ্রীচরণেষু—

বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদী পত্রখানি পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনার কোনও পত্রই আমি এর পূর্ব্বে পাই নাই। আপনার পত্র পাইয়া যেদিন উত্তর দিতে আমার আলস্য আসিবে, সেদিন যেন আমি আর এ পৃথিবীতে না থাকি। আমার এতদিন ধারণা ছিল, আপনি সাত-আনীতে জেঠামহাশয়ের বাড়ীতেই আছেন; এবং এই প্রকারই এখানকার সকলে আমাকে জানাইয়াছিলেন। আমার সে ধারণা যে ভুল, আপনার পত্র

পাইয়া তবে বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিতে পারিলাম—স্নেহান্ধ হইয়া মানুষ এমন ভুল হয় ত অনেকই করিয়া বসে। এ ভুল সংশোধন করিতে হইলে, ভগবানের অসীম দয়া প্রার্থনা করা ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নাই। যদিই থাকে—তবে আপনি আজ পর্য্যন্ত আমাকে সে শিক্ষা দেন নাই। শুধু আমাকে কেন—বিশ্বের কোন পতিব্রতা নারীকে কেহ কখনও সে শিক্ষা দিতে সাহস পায় নাই। আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে থাকিয়া আমি যে আপনার সেবা করিতে পারিলাম না, তাহা স্নেহান্ধতার কারণে, কি অধিকতর কর্ত্তব্যের খাতিরে, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দেওয়ান জেঠামশায় এখানে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন,—ডাক্তার, কবিরাজ সকলেই জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া আমরা এতদূর ব্যস্ত ছিলাম যে, তাঁহার সেবা ব্যতীত আর কোন কথাই তখন মনে হইত না। বন্যার রাত্রি হইতেই আপনার অসুখ এবং আপনি সাত-আনীতেই আছেন, এ কথা জানিয়া-শুনিয়াও আমার মনে হইত, এখন আপনার সেবার যতটা আবশ্যক, আমি হয় ত এখানে ততটা করিতে সক্ষম হইব না বলিয়াই, ভগবান্ দয়া করিয়া আপনাকে সাত-আনীতে রাখিয়াছেন। কারণ, আমার বিশ্বাস—আমার ধারণা—আমা অপেক্ষাও আপনার অধিক স্নেহের লোক, আমারই মন, প্রাণ, শক্তি প্রয়োগ করিয়া, একনিষ্ঠ ভক্তির সহিত আপনার সেবা করিতেছেন। অতি শৈশবে মার মুখে, পরে বড় হইয়া আপনার মুখে ও জেঠামশায়ের মুখে, কতদিন ধরিয়া কত কার্য্যের মধ্যে—কত-কতবার শুনিয়া আসিতেছি যে, একদিন সেখানের ঘর-বাড়ী, লোকজন সবই

আমার হইবে, আর মাত্র আমি তাঁহাদের হইব। আবাল্যের এ ধারণার উপর এতটা দৃঢ় বিশ্বাস কেন না আসিবে! কিন্তু আজ দেখিতেছি,—আমি এখন আর নিতান্ত বালিকা নাই—বিপদের মধ্যে পড়িয়া এই কয়দিনেই আমি অনেক সন্তানের মাতা হইয়া পড়িয়াছি। এখানে আমার একটি অতি বৃদ্ধ সন্তান রোগ-শয্যায় পড়িয়া, 'মা, মা,' বলিয়া ডাকিতেছেন, আর সেখানে বাবা আপনি, অতি শিশু-ছেলের মত অন্যায়ের আব্দার পূরণ করিবার জন্য, আপনার মার মুখেই যেন ঘোমটা টানিয়া দিয়া, খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। বাবা, আপনিই ত একদিন আপনার কুমারী কন্যার অন্তরে, বিনা বিচারে তাহার ভাবী স্বামীর স্বভাব-সুন্দর নির্ম্মল চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, এবং আপনার সে কন্যাকেই বিশ্বমাতার অসীম কৃপার প্রার্থী করিয়া, সারা বিশ্বকে সন্তানের চক্ষে দেখিতে ও সন্তানের স্নেহ-যত্ন দিতে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার শরীরে আমারই মা ঠাকুরমার রক্ত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সন্তানের শত দোষ মার্জ্জনা করিতে শিখিয়াছি। সন্তানের মাতৃ-দর্শনের ইচ্ছা হইলে দেশ, কাল, পাত্র বিচার না করিয়া এখানে আসিতে পারে। মাতৃ-মন্দিরে আসিতে কোন সন্তানই কখনও যেন কোন প্রকারে দ্বিধাবোধ না করে। সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য মাতার উন্মুক্ত হস্ত সর্ব্বদা প্রসারিত রহিয়াছে।

আপনার স্নেহের কন্যা—শ্রীমায়াদেবী।

পত্র পাঠ শেষ হইলে, দেববাবু জ্বলন্ত আগুনের শিখার ন্যায় চক্ষুর তেজ বাহির করিয়া, সেই অধীত পত্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, মনের মধ্যে

শিহরিয়া উঠিলেন। আর মনে করিতে লাগিলেন, যেন পত্রখানা কথা কহিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে—আর প্রতি অক্ষরের ঔজ্জ্বল্যে শত চক্ষু বাহির হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অমনই ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত দেববাবু হঠাৎ চেয়ার ত্যাগ করিয়া পাশের ঘরে যাইয়া, তাঁর মায়ের তৈল-চিত্রের নিম্নে গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই প্রকার অভিভূত অবস্থায় কতক্ষণ কাটিয়া গেল, মনের মধ্যে মুহূর্ত্তে কত কথা জাগিয়া উঠিল, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কতকাল পরে যেন পাষাণ গলিয়া গেল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষের গুরুভার ধৌত করিয়া, দেববাবু স্বর্গীয় পিতৃ-মাতৃ পদে অসংখ্য প্রণাম করিয়া প্রাণে নূতন শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন একরাত্রি মনের মধ্যে নানা চিন্তা পোষণ করিয়া, শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সদাশিববাবু স্বেচ্ছায় যদি কন্যাদান করেন, তবেই বিবাহ করিব ; নতুবা, চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া, দেশের ও দশের উপকারে জীবনপাত করিব। খেয়ালের বশে যে অন্যায় করিয়া বসিয়াছি, তাহার আর উপায় কি ? আজই সদাশিববাবুকে নারায়ণপুরে পাঠাইয়া দিব। দেববাবু অভিভাবকহীন হইয়া অবধি, যখন যাহা খেয়ালে আসিয়াছে, তাহাই করিয়াছেন। আজও সেই খাম-খেয়ালী বুদ্ধি পরিচালিত হইয়াই, কর্ম্মচারীদিগকে ডাকাইয়া সদাশিববাবুকে সসম্মানে নারায়ণপুরে রাখিয়া আসিতে আদেশ দিলেন।

বিদায়কালে নিজে যাইয়া সদাশিববাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সদাশিববাবুও অশেষ প্রকারে সৌজন্য জানাইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া, নারায়ণপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই দিনই অপরাহ্ণে সদাশিববাবু, সরকার মহাশয় ও দরওয়ান নারায়ণপুরে পৌঁছিলেন। আর সন্ধ্যার সময় নয়-আনীতে সংবাদ আসিল যে, দেববাবুর নূতন ম্যানেজার বাবু রাজবাড়ীর খাজনা যোগাড় করিয়া না দেওয়াতে, নয়-আনীর সমস্ত মহল বিক্রী হইয়া গিয়াছে। কে একজন স্ত্রীলোকের নামে সেই সমস্ত মহল ডাকিয়া লইয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে নামটা ঠিক জানিতে পারা যায় নাই।

২০

নারায়ণপুরে আসিয়া সদাশিববাবু দেখিলেন, দেওয়ানজী সুস্থ হইয়া কাজ-কর্ম্মের নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন। মায়া জ্ঞান-বাবুর সহিত কলিকাতা গিয়াছে। জ্ঞানবাবুর শরীর বড় খারাপ। দেশে এ বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত। শরীর খারাপ বলিয়াও বটে, আর কতকটা দেবনারায়ণবাবুর ভয়েও বটে, তাঁহারা দেওয়ানজীর পরামর্শমত কলিকাতায় গিয়াছেন। কলিকাতায় জ্ঞানবাবুর ভগিনীপতি, ভগিনী ও ভাগিনেয় সুধীর যে বাটীতে আছেন, জ্ঞানবাবু মায়াকে লইয়া সেখানে গিয়াছেন। দেওয়ানজীর পরামর্শে সদাশিববাবুও পরদিন কলিকাতায় যাইবেন স্থির করিলেন। মহামায়া ও তাহার মা বিষ্ণুপ্রিয়া দেওয়ানজীর অনুরোধে বাধ্য হইয়া নারায়ণপুরেই আছেন। নূতন মহল খরিদ হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা এখান হইতেই হইতেছে। সমস্ত মহল দখলে আনিতে ও আদায়-পত্র করিতে সময় যাইবে বলিয়া, তাঁহারা এখন আর বাড়ী যাইবেন না। সদাশিববাবুও তাঁহাদিগকে এখানে থাকিতে বিশেষ প্রকারে অনুরোধে আবদ্ধ করিয়া, সংসারের যাবতীয় ভার দিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইলেন।

সদাশিববাবু কলিকাতায় চলিয়া যাইলে পর, দেওয়ানজী মহামায়াকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, রোগ-শয্যায় অনেক অনাচার হয়েছে, আমার চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দাও। আগামী কল্য শুভদিনে এ কার্য্য সারিয়া লইতে হইবে।"

"মায়া এখানে ফিরে এলে পর এসব কর্‌লে হ'ত জেঠামশায়!"

"না মা, তোমার আদর-যত্নে আমার কোনও অসুবিধা হবে না। আর কিই-বা ধূমধাম হবে যে, ঘটা ক'রে সকলকে এ কথা জানাতে হবে। তোমার যা ইচ্ছে তাই ক'রে আমার এ কাজটার উদ্যোগ করে দাও মা! আমি এ কাজ সেরেই একবার দেববাবুর বাড়ী যাব মনে করেছি। সেখান হ'তে মহলের কাগজ-পত্রগুলো যদি যোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারি।"

"না জেঠামশায়, তা হবে না। তাঁর কোন সাহায্যই আমাদের নিতে হবে না। আপনি দেখে শুনে, লোকজন দিয়ে ক'রে নিন।"

"এখনও মনের মধ্যে অভিমান রেখেছ মা! এটা ভাল হচ্ছে না। তুমি যদি মা, আমার বাধ্য থাকাটা অপমান মনে কর, তা হ'লে আমি আর কোনও কথাই ক'ব না।"

"না জেঠামশায়, মনের মধ্যে যাই থাক্, আপনার সন্তোষের জন্য আমি সব কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছি। জীবনে কখনও আপনার অবাধ্য হব না। আপনার কথায় আমি সবই কর্‌তে পারি। আপনি তা পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পারেন।"

"মা, আমার সে বিশ্বাস আছে বলেই ত, আমি আজ সব ছেড়ে শুধু তোমার সাহায্যে এ কাজে হাত দিয়েছি। জ্ঞানবাবু, সদাশিব-বাবু, মায়া এঁরা এখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বলেই আমি তাঁদের কলিকাতায় যাবার পরামর্শ দিয়েছি। মায়ার বিয়ে

দিলেই কি আমার সব কাজ শেষ হয়ে যাবে? আমার অন্নদাতার কাজটি উদ্ধার ক'রে চুপ ক'রে থাকলেই কি আমার মনুষ্যত্ব বেড়ে যাবে? আমার মায়ের কাজও করা চাই। না হলে যে মায়ের ছেলে পর হয়ে যাবে মা!"

এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে আসিয়া বলিলেন—"বেলা হ'য়ে গেছে, আপনি খাবেন আসুন! দিনকতক একটু রোগীর নিয়ম মেনে চলুন, তা না হ'লে, শীঘ্র শরীর সারবে না যে!" অনুযোগের স্বরে এই কয়টা কথা বলিয়াই মহামায়াকে সেখানে দেখিয়াই রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোর কোন বুদ্ধি নাই, মানুষের উপর যত্ন নাই। দিন-রাত বাজে তর্ক ক'রে ক'রে তোর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। তুই দিনকতক নজর ছাড়া হ'য়ে সরে যা মহামায়া! তোকে দেখে আমার যেন কেমন একটা অশান্তি হয়েছে। হতভাগা ধাড়ী মেয়ে লেখাপড়ার দেমাকেই গেলেন আর কি! মেয়েমানুষ ক'রে ভগবান পাঠিয়েছেন, মেয়েমানুষের মত থাক্, মেয়েমানুষের যা কাজ তাই কর্। তা না ক'রে, সময় নেই অসময় নেই ক্রমাগত তর্ক, বকাবকি এই নিয়েই আছিস্। সব সময় সকলের কথায় কি করে উত্তর দিস্! একটু লজ্জা হয় না! বড়-মানুষের মুখের উপর কথা কহা তোর একটা রোগ হ'য়ে গেছে। এই যে একটা বুড়ো মানুষ বেলা দুপুর পর্য্যন্ত মুখে একবিন্দু জল না দিয়ে রয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে চলা কি তোদের লেখাপড়ায় তোদিকে শেখায় নি। তখনই আমি বলেছিলাম যে, 'বাবু তৈরী হতে কলেজে পাঠিয়ে মেয়ের মাথা খেও না। যাতে মা হ'তে পারে, এমন বিদ্যে সেখানে নেই। সংসারের মধ্যে মেয়েমানুষের শেখ্বার সব আছে, কেন

একটা মন্দের ছাপ নিয়ে আমাদের জ্বালাতন কর্‌বে, আর নিজেও জ্বালাতন হবে।' শেষে ঠিক তাই হয়ে দাঁড়াল। সর্ব্বগ্রাসী সব খেয়েও পেট ভরে নি। আবার এখানে এসে কাকে খাই, কাকে খাই ক'রে বেড়াচ্ছে। যেখানে যখন পা দিচ্ছিস্, সেইখানে তোর জন্যেই যত কিছু মন্দ সব হচ্ছে। এসব দেখেও নিজের উপর ধিক্কার আস্‌ছে না। যা, যা, নজর-ছাড়া হ'য়ে সরে যা।" বলিয়া নিজেই কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আর যাহার উপর এত বাক্যবাণ বর্ষিত হইল, সে নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া রহিল।

দেওয়ানজী বলিলেন—"মহামায়া, মাকে বলো আজ আমায় উপবাস থাক্‌তে হবে, কাল চান্দ্রায়ণ করে, ঠাকুরের প্রসাদ পাব। মাকে খেতে বলে এস। তুমি খেয়ে এস। আমারই দোষে তুমি এত-গুলো কথা শুন্‌লে। সকালে ব'লে দিলে আর এমনটা হ'ত না।"

"না জেঠামশায়, মায়ের অমন বকা অভ্যাস হ'য়ে গেছে, আমারও শুনে শুনে সব সয়ে গেছে। ছেড়ে দিন ও-সকল কথা। মাঝে মাঝে মায়ের মন খারাপ হলেই, মা অমন ক'রে বকেন। আপনার মাটি কেমন রাগী, কেমন মায়ের মেয়ে আজ দেখ্‌লেন ত জেঠামশায়। মায়ের মুখে এমনই বকুনি খেয়ে হাসিমুখে উড়িয়ে দিতে পার্‌বেন ত?"

২১

দেবনারায়ণবাবু দেশের মায়া কাটাইয়া একেবারে সুদূর পশ্চিমে যাইয়া বাস করিবেন বলিয়া চারিদিকে জনরব উঠিয়াছে। তাঁহার বাড়ীতেও সেই প্রকার ব্যবস্থা হইতেছে। এখনও যাহা

কিছু আছে, তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য যতটুকু বিলম্ব। একদিকে লগেজপত্র বাঁধিয়া সারি সারি সাজান হইতেছে, অপর দিকে দেশের গণ্যমান্য দুই চারিজন বসিয়া, এত বড় বনেদী বংশ একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়, তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য দেববাবুকে অনেক প্রকারে বিচারে, তর্কে, অনুরোধে, উপরোধে বুঝাইতেছেন। কিন্তু দেববাবু অটল-অচল হইয়া সকল কথা শুনিয়া যাইতেছেন। কাহারও কোন কথার প্রতিবাদ করিতেছেন না। এমন সময় মুণ্ডিত মস্তক অতি বৃদ্ধ এক ব্যক্তি দেববাবুর সম্মুখে আসিয়া জোড় হাত করিয়া বলিলেন—"বাবু, আমায় ভিক্ষা দিন।"

সকলের দৃষ্টি হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য ভিক্ষুক একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, দেববাবুর সম্মুখে একটি হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া কাটিয়া গেল। দাতা কিছুই বলেন না—কিছুই দেন না; দেখিয়া ভিক্ষুক আবার বলিল-"বাবু, অনেক বাড়ী ঘুরে ভিক্ষে যোগাড় কর্‌বার শক্তি নাই ব'লে আপনার নিকট এসেছি, আমায় ভিক্ষা দিন। আপনি গরীবের মা বাপ। ভিক্ষা দিন বাবু—আপনি রাজা হবেন।"

দেববাবু বলিলেন—"আর ও-আশীর্ব্বাদে কাজ নাই। ভিক্ষুকের আশীর্ব্বাদের জোরে রাজা হ'তে আমার মোটে ইচ্ছা নাই। সদর দরজায় যাহা ভিক্ষা দিতেছে, তাই নিয়ে সরে পড়। পরকে রাজা হ'বার আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পার—আর নিজে রাজা হ'বার বর দেবতার নিকট প্রার্থনা কর্‌তে পার না—যাও, যাও, বিরক্ত ক'রো না।"

ভিক্ষুক এবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"রাজা হব কি বাবু, রাজ্যরক্ষার বুদ্ধি নেই যে। রাজাই ত ছিলাম, বুদ্ধির দোষে আজ এই ভিক্ষুক হয়েছি,—এমন অনেকেই হয়ে থাকে বাবু। রাগ করবেন না বাবু! মুষ্টি-ভিক্ষায় এ পেট ভরে না বলেই ত আপনার কাছে হাত পেতেছি, দয়া ক'রে ভিক্ষা দিন্, বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

এবার ভিক্ষুকের নির্ভীক কণ্ঠস্বরের মধ্যে এত বড় কথা শুনিয়া সকলেই চাহিয়া দেখিল।

"কে তুমি ভিক্ষুক? কখনও কেহ ত এমন কথা আমায় বলে নাই! এস ভিক্ষুক—এস আমার রাজা—এস আমার গুরু, আমার সব দর্প চূর্ণ ক'রে তোমারই মত ভিক্ষুক ক'রে দাও।" বলিতে বলিতে দেবনারায়ণবাবু উঠিয়া সেই ভিক্ষুকের পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। ভিক্ষুকও আনন্দ-অশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল,—

"দেবনারায়ণবাবু, আজকের দান কখনও ফিরিয়ে নেবেন না ত?"

দেববাবু এবারে ভিক্ষুকের সহজ কণ্ঠ শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেওয়ানজী,—নারায়ণপুরের দেওয়ানজী! আপনি ভিক্ষুক?"

"দোষ কি দেববাবু, দেওয়ান হ'য়ে যা করতে পারি নি, আজ ভিক্ষুক হয়ে তা সফলই হ'ল ত? এ ভিক্ষায় যে আমার কত তৃপ্তি—কত আনন্দ—কত লাভ হ'ল, তা বুঝিয়ে বল্‌বার মত আমার মনের অবস্থা নেই,—আমি এমন আনন্দিত হয়েছি। সময়ে সে সব বুঝিয়ে বল্‌ব। এখন যা কিছু হচ্ছে, সব বন্ধ করে দিন। এখন আর পশ্চিমে যাওয়া হবে না। বিষয়েরও এমনভাবে ব্যবস্থা

করতে দিতে আমি পারি না। এরূপ বলায় কিছু দোষ হচ্ছে না ত? কারণ, আপনি যখন আমার ভিক্ষালব্ধ—তখন আপনারি যা কিছু সবই ত আমার। বলুন—বলুন দেববাবু! বড্ড দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। ভিক্ষালব্ধ দানে আমার অনেক দিনের ক্ষিদে মিটিয়ে নিতে হবে। বলুন, বলুন—দেরী ক'রে আর বুড়ো মানুষকে কেন কষ্ট দেবেন।"

"তাই হোক্, আপনার পথেই আমাকে টেনে নিন। আমারই বা ভিক্ষুকের দশা পেতে আর বাকি কি? কিন্তু আপনি কি দুঃখে এমন হলেন দেওয়ানজী।"

"সে কি দেববাবু, পঞ্চাশের পরই বনে যাওয়া উচিত ছিল—তা ত হয়নি। এখন একাশি বছরের বুড়ো আত্মীয়-স্বজন, বান্ধব, পুত্র, পৌত্র পরিত্যক্ত জীবনেও যদি বানপ্রস্থ অবলম্বন না করি, তবে আর কবে করবো।"

নানা কারণে নারায়ণপুরে ফিরিতে দেরী হইতে লাগিল বলিয়া দেওয়ানজী দেববাবুর অজ্ঞাতে মহামায়াকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। "মা, আমি যতদিন পর্য্যন্ত ফিরিয়া না যাই, ততদিন পর্য্যন্ত আমার ঘরেই দিবারাত্রি সাবধানে থাকিবে। আয়নার উপর নজর রাখিয়া সমস্ত দেখিবে। নূতন কোন লোক আসিলে তাহার পরিচর্য্যার ভার নদেরচাঁদের হাতে দিবে। কেহ সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, বামনকে পাশের ঘরে রাখিয়া, কোন ঝিকে সঙ্গে লইয়া, পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া ঝির দ্বারা কথার জবাব দিও। কেহ অতিথি বলিয়া পরিচয় দিলে তাহার মর্য্যাদা

সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিও। যেন কোনও প্রকারে তাহার অমর্য্যাদা না হয়। নিজের কৌমার্য্য-ধর্ম্ম সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রকারে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এসব যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে যদি তোমার জীবন দিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাদ্পদ হইও না। মা, তোমার এই বৃদ্ধ সন্তানের মুখ চাহিয়া তাহার মাতৃনামের সার্থকতা করিও। এর বেশী আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।”

দেওয়ানজী দুই তিন দিনেই দেববাবুর সহিত এমন মেলামেশা করিয়া ফেলিলেন যে, দেববাবুর মনের কোন কথাই জানিতে আর বাকি রহিল না। তখন বুঝিতে পারিলেন—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও, এখনও মনের চাঞ্চল্য যায় নাই। একটু চতুরতা অবলম্বন ব্যতীত ইহার মনের বিকার সারানও কঠিন বুঝিয়া একদিন দেববাবুকে বলিলেন, “সদাশিববাবু আমার উপর সন্দেহ করেছেন যে, আমি আপনার সঙ্গে একযোগ হয়েই তাঁকে এতদিন এখানে থাক্‌তে বাধ্য করেছি। এই ধিক্কারেই আমি তাঁর সংস্রব ত্যাগ ক’রে আপনার নিকটে এসে দেখাতে চাই যে, আমি দেববাবুর সঙ্গে যোগ দিলে অসাধ্যসাধন কর্‌তে পারি। আমার কূটনীতি আর আপনার শক্তি এই দুটো একসঙ্গে দাঁড়ালে সাত-আনী আর নারায়ণপুরের মধ্যে বিবাদের একটানা স্রোতের নদী বহিয়ে দিতে একটুও দেরী হয় না। তাঁদের বড় অহঙ্কার যে, তাঁদের মধ্যে বড় বিচ্ছেদ কখন কেউ এনে দিতে পারে নি—পারবে না। শত দোষেও ক্ষমা কর্‌তে তাঁরা পরস্পরে সক্ষম। কিন্তু যে বিষয়ের লোভে জ্ঞানবাবু, সদাশিববাবুর খোসামোদ ক’রে বেড়াচ্ছেন, সেটা কার হাতে, তা এখনও জানেন না; তাই

এত বাড় বেড়ে গেছে। বিষয়ের অন্ধি-সন্ধি জান্‌তে এখন অনেক দেরী। তাই বল্‌ছি, দেববাবু, এই সুযোগে আপনি আপনার সব গুছিয়ে নিন। আমার এতদিনের পাকা দাড়ি—পাকা চুল কেন ফেল্‌তে হয়েছে জানেন? তারা মনে করেছে যে আমি বিশ্বাসঘাতক। এই বিশ্বাসঘাতককে অপমান ক'র্‌তে তারা আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিতে চেয়েছিল। এত বড় অপমান হওয়ার আগেই আমি আমার বহু পুরাতন আদরের দাড়ি চুল ফেলে দিয়ে সেখান হ'তে চান্দ্রায়ণ করে, সদাশিববাবু ও জ্ঞানবাবুর অজ্ঞাতে এখানে চলে এসেছি। কিন্তু, আমার মন এমন পাগল যে, এত অপমান হবার আশঙ্কা থাক্‌লেও মহামায়ার জন্য মনটা কেমন কেঁদে উঠ্‌ছে। তাকে ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতেও যেন পার্‌ছি না। এ কি মায়া দেববাবু, তা কি ক'রে আপনাকে বোঝাব? আহা বেচারী আমার, কত বড় অভিমান নিয়ে আবাল্যের এক কথা শতবার ব'লে ব'লে আমাকে কি মায়ায় যে ফেলেছে, তা আর কি বল্‌বো দেববাবু! যেদিন আপনার মহল কেনার জন্য, তার মায়ের সঞ্চিত টাকা চাই, সে দিন আমার মায়া কি বলেছিল শুন্‌বেন দেববাবু! বল্‌লে, 'রাজার খাজনাটা পাঠিয়ে দিন, আর যাঁর মহল তাঁকে ব'লে পাঠান, সুবিধামত যেন টাকাটা আমাদের ফিরিয়ে দেন।' আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, 'তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না মা।' তাতে সে বল্‌লে, 'জেঠামশায়, আমি ঠিকই বলেছি। এ সব টাকাকড়ি এতদিন তাঁরই হ'ত, লোকে তা জানে না বলেই মনে কর্‌বে যে, সব নিলামে বিক্রী হ'য়ে গেল। এত বড় অপবাদটা তাঁর হ'ক, তা আমার ইচ্ছে নয়।' তখন জ্ঞানবাবুর পরামর্শেই আমি

মহামায়ার নামেই আপনার মহলগুলো কিনে দিয়েছি। তা যাই হোক, এখনও ফেরাবার একটা মাত্র উপায় আছে। আপনি যদি সম্মত হন, তাহ'লে এক্‌বার চেষ্টা ক'রে দেখা যায়।"

দেববাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাঢ় চিন্তা করিয়া শেষে বলিলেন, "পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে মহল ফিরিয়ে নেবার অর্থ আমার কোথায় দেওয়ানজী! তা ছাড়া, আপনিই ত বলেছেন, রাজা হওয়া সহজ, রাজা রক্ষা করাই কঠিন। এ কথাটায় আমার মনে এমন ঘা দিয়েছে যে, আমি সারা জীবনের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি। আর উপায় আছে ব'লে আমার মনে হয় না। তবে যদি ন্যায়মত কোনও উপায়ে তা হয়, তাতে আমার অমত নেই। কোন প্রকারে আমি এ বিষয়ে অন্যায়ের সাহায্য নিতে পার্‌বো না। যা অন্যায় করেছি, তারই পরিণামে ইহজীবন ত ভস্মে পরিণত হ'ল। পাপ বাড়িয়ে পরজীবনটাও নষ্ট কর্‌তে আমার আর সাহস হয় না।"

"আমায় এত নীচ মনে কর্‌বেন না দেববাবু! আজীবন যে কাজে হাত দিয়েছি, তাতেই কৃতকার্য্য হয়েছি। কেন কৃতকার্য্য হয়েছি জানেন, কখন মন্দ করিনি ব'লে। আর কাজের খাতিরে যে দিক দিয়ে গেলে লোকের মন্দ না হয়, সেই দিক দিয়ে গেছি ব'লে। লোকের মন্দ কখনও করিনি, কখনও কর্‌বো না, ভালর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে এসেছি—আর তাই কর্‌বো। সারা জীবনের কর্ম্ম এই এক সুরে বেঁধে নিয়েছি। অন্যরূপ হ'য়ে থাকে ত বল্‌তে পারি নি। গত জীবনের প্রথম সূচনা হ'তে আজ পর্য্যন্ত চেয়ে যতটা দেখ্‌তে পাচ্ছি—তাতে কোথাও অতৃপ্তির গ্লানি নেই। আপনার কাজে হাত দিয়ে যদি তা হয় ত হবে,

তার জন্য আমি তৈরী হ'য়ে থাক্‌বো। এত বড় সুদীর্ঘ জীবনে একটা কলঙ্কের রেখাপাতে আমায় আর কত দুঃখ দেবে দেববাবু! যাতে এই এত বড় বংশের কীর্ত্তি লোপের চেয়েও বেশী গ্লানি আস্‌তে পার্‌বে। একটা গৌরবের আলো চিরদিনের জন্যে নিভে যাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বো। একটুও চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো না, যে, আমরা সেটা বজায় রাখ্‌তে পারি কি না?"

"মহতের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্—আমি নিমিত্ত মাত্র হ'য়ে, আপনার সব আদেশ বিনা বিচারে পালন কর্‌তে প্রস্তুত।"

২২

সূর্য্যদেব কার্ত্তিকের প্রখর রৌদ্রে প্রকৃতির শ্যামলতার উপর কৃষ্ণবর্ণের তুলি বুলাইতে বুলাইতে যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া পশ্চিমের আকাশে অঙ্গ ঢালিয়া নিদ্রার ক্রোড়ে যাইবার জন্য ধীর মন্থর গমনে সুদূর গগনপ্রান্তে চলিয়াছেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার কাহারও দৃষ্টির উপর নিজের সম্যক্ শক্তি দেখায় নাই। সবে মাত্র গৃহস্থের বধূগণ শঙ্খ লইয়া অতি নিভৃত কক্ষে দাঁড়াইয়া, লজ্জা-রাগ-রঞ্জিত মুখে তাহা বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেবালয়ের আরত্রিকের প্রথম বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে দেববাবু লজ্জার রক্তিম আভা মুখে মাখিয়া তাঁর চির উদ্ধত শিরকে নত করিয়া নারায়ণপুরের সদর কাছারীতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সদর কাছারীর সকল কর্ম্মচারীই তখন নিজের নিজের কাজ সারিয়া বিশ্রামালাপে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। দেব-

বাবুকে হঠাৎ সন্ধ্যার প্রাক্কালে একাকী উপস্থিত হইতে দেখিয়া, অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিস্ময়ের সহিত সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যথাযোগ্য সম্মান দেখাইতে কোন পক্ষেরই ক্রটি হইল না। সদর নায়েব মহাশয় বাড়ীর ভিতরের চাকর নদের-চাঁদকে ডাকাইয়া ভিতরে সংবাদ দিবার জন্য বলিয়া দিলেন—"নদেরচাঁদ, মায়েদের নিকট সংবাদ দাও, নয়-আনীর শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয় বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন।"

বহু প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত নদেরচাঁদ শির নত করিয়া মস্তকে দক্ষিণ হস্ত ঠেকাইয়া চলিয়া গেল।

দেববাবু আসন গ্রহণ করিলে পর, সদরের প্রধান প্রধান দুই চারিজন কর্ম্মচারী আসন গ্রহণ করিলেন ও অপর সকলকে বলিয়া দিলেন—"আপনারা ইচ্ছা করিলে এখন নিজের কাজে যাইতে পারেন।"

সন্ধ্যার আরতি থামিয়া গেল। নদেরচাঁদ ভিতর হইতে আসিয়া সদর নায়েব মহাশয়কে বলিল, "বাবুকে লইয়া আপনি খাস-কামরায় যেতে পারেন। বাবুর আজ এখানে অবস্থান হবে কি না, ও বাবুর সঙ্গে কয়জন লোক আছে, সে সংবাদ দেবার জন্য দিদিমণি বলে দিয়েছেন।"

দেববাবু বলিলেন—"আমি একাই আছি। কাজের কথা সারিয়াই চলিয়া যাইব।"

নায়েব মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দয়া ক'রে আজ আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। রাত্রে একা আর ফিরে গিয়ে কাজ নাই। সকালে যাবার ব্যবস্থা করলে বিশেষ ক্ষতি হবে কি?"

দেববাবু বলিলেন—"কার্য্যোদ্ধার যদি হয়, তখন থাকার ব্যবস্থা

করা যাবে। না হ'লে আপনাদের এত বড় বাড়ী থেকে না হয় আমার মত একটা সামান্য অতিথি বিমুখ হ'য়েই ফিরে যাবে।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন—"পঁচিশ বছর এখানে কাজ করছি, তার মধ্যে ত বাবু, কাকেও ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যেতে দেখিনি। চিরদিন যা হ'য়ে আসছে, আজও তাই হবে—আমার এই বিশ্বাস। আজ আর আপনার যাওয়া হবে না। নদেরচাঁদ, বাবুর মুখে যা শুনলে তাই বাড়ীতে বল গে।"

কাছারীবাড়ীর পার্শ্বেই অন্দর-বাড়ীর সহিত সংলগ্ন দ্বিতলের উপর খাস-কামরা। নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে দেববাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একদিকে বিস্তৃত ঢালু বিছানা পাতা রহিয়াছে। অপরদিকে একটি আসনের সম্মুখে একখানি গরদের কাপড় ও সন্ধ্যা-আহ্নিকের সমস্ত আয়োজন করা রহিয়াছে। সন্ধ্যা-আহ্নিকের আসনের পার্শ্বে অপর একখানি আসনও বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে কিছুই নাই। কক্ষটির চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই মনে হয় যেন ইহা একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরী। চারিপার্শ্বেই বড় বড় আলমারি-ভরা বই। আলমারির মাথার উপর একটানা কাঠের তক্তার উপর সাজাইয়া সাজাইয়া যত সব মহলের কাগজ-পত্রের দপ্তর রহিয়াছে। প্রত্যেক দপ্তরের উপর হইতে একটি একটি মোটা কাগজের টিকিট ঝুলিতেছে; তাহাতে মহলের নাম, খাতার নম্বর, সন, তারিখ দেওয়া রহিয়াছে। দেববাবু চারিদিক্ ঘুরিয়া আসিয়া বিছানার উপর বসিলেন। নায়েব মহাশয়ও তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল, কেহই কোন কথা কহিলেন না। অবশেষে নায়েব

মহাশয় বলিলেন—"জামা কাপড় ছাড়িয়া হাত-মুখে জল দিন্। সন্ধ্যা-আহ্নিক করা হয় কি?"

"আগে হত না। এই পাঁচ ছয় দিন আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিয়াছি।"

"সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া লউন। আমি আহ্নিক সারিয়া এখনই আসিতেছি।"

"আপনি সত্বর আসিবেন।" বলিয়া দেববাবু জামা কাপড় ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া সন্ধ্যার আসনে বসিলেন।

সন্ধ্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, পার্শ্বের আসনে জলখাবারের জিনিস-পত্র সাজান রহিয়াছে।

কাহার জন্য এ সব আয়োজন ইহা বুঝিলেও, কেহ না বলিলে দেববাবু বসেন কি করিয়া? এমন সময় আর এক প্রস্থ জলখাবার আনিয়া, একজন পরিচারক নদেরচাঁদকে ডাকিয়া বলিল—"নায়েব মহাশয়েরও ঠাঁই এখানে করে দাও।" দেববাবুকে বলিল—"আপনি জলযোগ করুন।" এই কথা শেষ হইতে না হইতে নায়েব মহাশয় আসিয়া দেববাবুকে আসনে বসিতে অনুরোধ করিয়া, নিজে অপর আসনে বসিলেন। দেববাবু আসনে বসিয়াই বলিলেন—"আচ্ছা নায়েব মশায়, আমার আসার কথা আপনারা কেউ কি আগে শুনেছিলেন? এত আয়োজন এই সময়ের মধ্যে হওয়া, এই অজ পাড়াগাঁয়ে সম্ভব বলে মনে করতেই পারছি না।"

"ঠাকুর-সেবার প্রতিদিনই এমন ব্যবস্থা আছে।"

নানা কথা কহিতে কহিতে জলযোগ সমাধা করিয়া দেববাবু বলিলেন—"নায়েব মশায়, আমার উদরের তৃপ্তির মত মনের তৃপ্তি যাতে হয়, তার ব্যবস্থা কি করছেন?"

"আপনার আদেশ পেলেই সংবাদ দিই। এখানে বসেই সব কথা হবে।" এই বলিয়া নায়েব মহাশয় বামনকে ডাকিলেন, "বামন, তোমার মাকে বল, খাস-কামরায় নয়-আনীর বাবু জলযোগ সেরে আপনার অপেক্ষা কর্‌ছেন।"

বামন চলিয়া গেলে, দেববাবু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—"নায়েব মশায়, এখানে আমি সবই অদ্ভুত দেখ্‌ছি। আপনাদের এই নদেরচাঁদ তেকেলে বুড়ো, মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, তবুও কাজ কর্‌ছে। মাথার সাদা চুল দেখেই যা মনে হচ্ছে বুড়ো। কিন্তু দেহের গঠন যেন যুবার মত। আর এই বামন, এ নামেও যা, আকারেও তা। তারও মাথার সাদা চুল পিঠে এসে পড়ে কি বাহারই হয়েছে। কিন্তু চাউনিটা কি তীক্ষ্ণ, যেন মনের ভেতর পর্য্যন্ত দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে। তার পর যত সব বুড়ো লোকে—এই আপনাদের কাছারীটে পূর্ণ, তা'ও দেখে এলাম। এদের নিয়ে কি করে, এত বড় মহল নির্ব্বিবাদে চল্‌ছে বলুন দেখি? অবশ্য আপনি মনে অন্য ধারণা কর্‌বেন না। আপনাদের মত এই এতগুলি প্রবীণ একসঙ্গে এর আগে আর দেখিনি, তা নয়; হয় ত দেখেছি, কিন্তু এক কাজের মধ্যে দেখিনি। সকলেই কি বরাবর আছে?"

"বেশীর ভাগ তাই বটে। আমাদের দেওয়ানজী আজ-কালকার শিক্ষিত অপেক্ষা বহুদর্শী প্রবীণ লোকই পছন্দ করেন। তাঁর ধারণাই হচ্ছে—লেখাপড়া বেশী জানুক আর নাই জানুক, অনেক দেখেছে—অনেক শুনেছে, অথচ সরল ও সত্য ব্যবহারে অভ্যস্ত, এমন মানুষকেই কাজের লোক করে তোলা যায়। আর ভাষায় পণ্ডিত, লোককে মুখের দৌড়ে যত বড়াই দেখা যাক

না, কেন, কাজে তত পাওয়া যায় না। তাই এখানে দেওয়ানজীর ব্যবহার যিনি একবার মাত্র পেয়েছেন তার আর বার হবার উপায় নাই। তাঁর আদরের অত্যাচারেই আমরা এখানে বুড়ো হয়ে গেলাম বাবু। তিনি যে শুধু আমাদের মত বুড়োই পছন্দ করেন, তা নয়; ছেলেদের মধ্যে যারা খুব সাহসী, যারা গায়ের জোরে—মনের তেজে একটা কিছু উচিত কাজ করতে ভয় পায় না, তাদের তিনি যেন মাথায় করে নেচে বেড়াতে পেলে বাঁচেন। যে যাই করুক না—এই সারা গাঁয়ের ছোট বড় সব ছেলেরাই তাঁর কাছে সব কথাই অসঙ্কোচে বল্‌বার জন্য ছুটে আসে। সকালে দেখ্‌তে পাবেন, গ্রামের প্রত্যেক ঠাকুর-বাড়ীতে গ্রামের প্রত্যেক ছেলেটি প্রণাম করে বেড়াবে। তাঁর এই সাত্ত্বিক শিক্ষায় এমন অদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাঁর নামে কেমন সব নেচে উঠে। এই ক'দিন তাঁকে দেখ্‌তে না পেয়ে যেন সবাই মনমরা হয়ে গেছে।"

যখন এই প্রকার কথাবার্ত্তায় তাঁরা উভয়ে অন্যমনস্ক, তখন ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে নদেরচাঁদ একটি পর্দ্দা টানিয়া দিয়া গেল। পর্দ্দা টানার শব্দ শুনিয়া নায়েব মহাশয় বলিলেন, "মায়াদেবী আস্‌ছেন, আপনার যাহা কিছু বক্তব্য বল্‌তে পারেন। আমি পাশের ঘরেই আছি। দরকার হলেই ডেকে পাঠাবেন।" এই বলিয়া নায়েব মহাশয় পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

পর্দ্দার যে দিকে মহামায়া ও ঝি আসিয়া দাঁড়াইল, সে দিকের আলো পূর্ব্বেই নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেববাবু যেমন বিছানায় বসিয়াছিলেন, তেমনই বসিয়া রহিলেন।

পর্দ্দার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঝি বলিল, "দিদিমণি বল্‌ছেন, কাছারীতে

আপনি যে পত্র দিয়েছিলেন, সে পত্র উনি দেখেছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে কি করা যুক্তিসঙ্গত, আপনার নিকটেই উনি তার পরামর্শ চাচ্ছেন।"

দেববাবু বলিলেন, "নায়েব মশায়, আমার পত্রের উত্তরে নায়েবকে লিখেছেন—'যাবতীয় বৈষয়িক কার্য্যের ভার আপনার উপর। বিশেষ আপনার এই নূতন নিলাম-খরিদা মহলের ভার এখনও কারও উপর দেন-নি, সে সম্বন্ধে সাক্ষাতে সব কথা হওয়াই সঙ্গত।' এই কথা শুনেই আমি আপনার নিকট এসেছি। এ ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ কি থাক্‌তে পারে? আর আমার সব কথাই বলে পাঠিয়েছি। কার্য্যোদ্ধার না হলে আমার মত একটা সামান্য অতিথি বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে; এ কথাতেও কি আমার সব বলা হয়নি?"

এবার মহামায়া বড় করুণ-কণ্ঠে পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিল, "অতিথি হয়েও যদি কিছুমাত্র অসন্তোষ আনেন, তা হ'লে আমাদের অকল্যাণ করা হয় যে। আমার বলার দোষে যদি আপনি অন্যরকম বুঝে থাকেন, তার জন্য আমি একশ' বার আপনার কাছে মাপ চাইছি। আমার অভিভাবক হিসাবেই আপনার নিকট এ সম্বন্ধে যদি সঙ্গত পরামর্শ চাই, তাতে আমার কিছু অন্যায় করা হয় কি?"

"এ কি কথা? আমার সে সৌভাগ্য যদি কখনও হয়, তখন এর উত্তর আমি দেব। এখন আমি যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে পথের কাঙ্গালের অধম হয়েছি। তার উপর বুদ্ধির দোষে যা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই আজ অপরের দয়ায় ফিরে পাব এই আশা করে এসেছি। এখন আমি কি পরামর্শ দেব?"

"এ আর এমন কি শক্ত কথা। আপনি মনে করুন না, আমার মহল সব বিক্রী হয়ে আপনার হাতে এসেছে। আর আপনার কাছে আমি আমার মহল-মজকুরা—আমার যা কিছু সবই ফিরিয়ে চাচ্ছি।"

"দেখ, ঠিক এই অবস্থায় পড়্‌লে, আমি যা বল্‌তাম সেটা না শোনাই উচিত। কারণ বুঝ্‌তেই পারছ যে, এই মহল ফিরিয়ে নিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে আরও বড়-বড় সু কি কু ঠিক জানি না, একটা অভিসন্ধি ছাইয়ে ঢাকা আগুনের মত লুকানো রয়েছে। সকলেই প্রথমে মনে মনে কাজের একটা সূচনা করে, পরে কথায় বলে, তার পর কাজে করে। আমারও মনে যেটার সূচনা হয়েছে, সেটা কথায় বা কাজে হবে কি না জানি না, যদি একান্তই শুন্‌তে চাও, তবে শোন। আমার কাছে ঠিক এই অবস্থায় তুমি গেলে, বল্‌তাম—'বিবাহ করে আমায় তোমারই করে নাও। আমার যা কিছু সবই তোমার হক্; তোমার যা কিছু সবই আমার হক্'।"

মহামায়া এবারে দৃঢ় অথচ ঈষৎ আক্ষেপের স্বরে বলিয়া উঠিল, "মানুষ এত অধঃপাতে না গেলে, বুঝি তার এমন ভাবে লক্ষী ছাড়ে না। যাক্, আপনি আপনার মনের কথাই যে সত্য বলেছেন, তার জন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ! আমি এর আগে বাবার কাছে শুনেছিলাম, আপনার কল্‌কাতায় বিয়ে হয়ে গেছলো না?"

"বিয়ে হয়নি, তবে বিয়ের সব কথা ঠিক্ হয়ে গেছ্‌লো বটে।"

"কেন সেখানে বিয়ে হ'ল না, এ কথা বল্‌তে আপনার কোন বাধা আছে কি?"

"বাধা আর এমন কি? তবে সে সব কথা, তোমার না শোনাই ভাল, আর শুনেও কোন লাভ নেই ত?"

"লাভ-লোকসান ভেবে কি আমরা সব কাজ করি—না কর্‌ছি। এই যে আপনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশের কুমারীকে আপনার বিষয় সম্পত্তি দিয়েও বিয়ে কর্‌তে চান বলে মনের কথা প্রকাশ করে বল্লেন, এতে আর আপনার লাভ কি হ'ল? কিন্তু একজনের মানের বিশেষ হানি হ'ল। যাক্, ও কথা ছেড়ে দিন। আমার ওটা শোন্‌বার বিশেষ আগ্রহ হচ্ছে যে, সব ঠিক হয়েও কেন বিয়ে হ'ল না? অথচ, আপনার অন্তরঙ্গ যাঁরা, তাঁরাও জানেন, আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। আর তাঁদেরও বন্ধুবান্ধব হিসাবেই আমরাও তাই জানি।"

"মহামায়ার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে না-কি?"

"শুধু আলাপ! তার কথা আমি যত জানি, বোধ হয় এত আর কেউ জানে না।"

"কখনও তোমায় সেখানে দেখিনি?"

"দেখেন নি তাই রক্ষে! তা হ'লে আবার একটা বিশ্রী ব্যাপার না হয়েই কি যেত?"

"কেন? এমন আইবুড় ছেলে-মেয়ের কত সম্বন্ধ হয় যায়। দেখা হলে এমন আর কি দোষ হ'ত?"

"বেশী আর কি, যেমন মহামায়ার হয়েছে।"

"কেন মহামায়ার কাছে আমি এমন আর কি দোষ করেছি, যার জন্য একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে, বল্‌ছো?"

"আর বাকিই বা কি? হিন্দুর ঘরের—ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ের বাক্‌দানের পর আর বিয়েই হ'তে পারে না। এ ছাড়া আপনাদের

বিয়ের প্রায় সবই হয়েছিল—মাত্র মন্ত্র ক'টা পড়া হয়নি এই ত ? আপনার দোষ কি, তবে শাস্ত্রকারগুলো এ সব পাপের যা শাস্তি বলে গেছেন—তাতে আপনার মত লোক ভয় পান না এই যা দোষ। আর সব দোষের সেরা দোষ—তার কপাল।"

"তুমি রাগ করো না। এ দোষ শুধু আমার একার নয়। দোষ আমাদের দু'জনেরই আছে। আমি অভিমানে অন্ধ হয়ে চলে এসেছি, সেও অভিমানে অন্ধ হয়ে আমায় ডাকেনি।"

"কিন্তু আজ আপনি সে সব ভুলে গিয়ে, অপরের বাক্‌দত্তা পত্নীকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত নন্। রূপমুগ্ধ হয়ে আপনি কত বড় অন্যায় না করেছেন, দেখুন দেখি। এর ন্যায়বিচার আমি আপনারই মনুষ্যত্বের নিকট প্রার্থনা করছি। আপনি বলুন, এখন আপনার, আমার—মহামায়ার কার কোন্ পথে দাঁড়ান উচিত ?"

"আমার এ বিচারে অধিকার নাই। আমি এর বিচার করতে পারি না। আমি সারাজীবন অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে পরের ভুলই দেখে এসেছি, কখনও নিজের ভুলের দিকে চেয়েও দেখিনি। চিরদিন নিজেকে অভ্রান্ত বলে মনে-মনে ধারণা করে এসেই আমার এই অধঃপতন। তোমার হৃদয়ের মত বল আমারও হৃদয়ে যাতে হয়, তার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর। তুমি আমায় ক্ষমা কর। আর বলে দাও, মহামায়া কোথায় ? আমি তাহার নিকটও ক্ষমা চাহিব।"

মহামায়া এখন আর কি করিয়া বলিবে যে, এই তোমারই সম্মুখে দাঁড়াইয়াই সে তাহারই স্বামীর পরীক্ষা করিতেছে। স্বামীকে বিশুদ্ধতার অগ্নিতে পোড়াইয়া নিজের অশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া লইতেছে। তোমারই ধ্যানে জীবন কাটাইয়াও, আজ

তোমারই সান্নিধ্যে আসিতে পারিতেছে না। তুমি তাহাকে ডাকিয়া লও—সে যে তোমার ক্ষণিক চাঞ্চল্যের ফলে, কর্ত্তব্যের পথে দাঁড়াইয়াও অভিমানে যেমন তোমার পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে—তেমনই তাহা অসম্পূর্ণ রাখিতে বাধ্য হইল। নারী-হৃদয় লইয়া কি স্বামীর পরীক্ষা করা চলে? ওগো অন্তর্যামী দেবতা, তুমিও তাহাকে ক্ষমা করিও।

এমন সময়ে দেওয়ানজী মহামায়ার হাত ধরিয়া সেখানে আসিয়া বলিলেন, "দেবনারায়ণ, আজ যাহার নিকট তোমার মনের ভ্রম ঘুচিয়া গেল—আজ যে তোমাকে ধর্ম্মের পথে টানিয়া আনিল—সেই তোমার ভাবী সহধর্ম্মিণী, এই মহামায়া। মা, মহামায়া আজ তোদের আশীর্ব্বাদ করি, সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, বিচ্ছেদশূন্য হয়ে অনন্তকাল স্বামিসুখ ভোগ কর, আর দেশের ও দশের সেবা কর। স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হয়ে প্রকৃত সৌভাগ্যশালিনী হও।

"এস দেবনারায়ণ, এস মা মহামায়া, তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌বার জন্য জ্ঞানবাবু ও সদাশিববাবু বাড়ীর মধ্যে এখনই আস্‌ছেন। তাঁরা এইমাত্র কল্‌কাতা থেকে এলেন। এ সংবাদে তাঁরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, তার আর কি বল্‌ব।"

দেববাবু বলিলেন, "আমিও এই সময় মায়াকে আশীর্ব্বাদ করে যেতুম। তিনিই ত একদিন আমারই পিতামহের বংশের কুললক্ষ্মী হয়ে—আমারই কনিষ্ঠের গৃহলক্ষ্মী হয়ে—আমাদের একমাত্র বৌমা হয়ে, আমাদের বাড়ী যাবেন।"

মায়া দূর হইতে এই কথা শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত মুখে দেববাবুর নিকট আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলকে প্রণাম করিল।

দেববাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন—"মা, স্বর্গ যেমন স্থির—পৃথিবী যেমন স্থির—সমস্ত জগৎ যেমন স্থির—এই পর্ব্বত সকল যেমন স্থির, সেইরূপ তুমি তোমার পতিকুলে স্থির হইয়া থাকিও।"

দেওয়ানজী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—"চিরদিনটা তোকে 'মা, মা,' বলে ডেকে এসেছি, তাতে তোর এমন হাসিমুখ দেখ্‌তে পাইনি। আজ যেমন ভাসুরের মুখে 'মা' ডাক শুনতে পেয়েছিস, অমনি হাসিমুখে ছুটে এসে প্রণাম কর্‌ছিস্‌। ওগো তোমরা সকলে দেখ, এই মেয়ের জাতটা—এই মায়ের জাতটা কেমন হাসি-মুখে বুড়ো ছেলের মায়া কাটিয়ে কোলের ছেলেকে কোলে তুলে নিচ্চে। তা হ'লে আর এ বৃদ্ধ দেওয়ানজীর প্রয়োজন নাই; এতকাল যে আশায় এই সব নিয়ে কাটিয়েছি, তা সার্থক হয়ে গেল। এইবার দেওয়ানজীর ছুটী! এখন যে দেশে যাব, সেখানে ত আর দেওয়ানী মিল্‌বে না—সামান্য একটা পাইকগিরী পেলেই কৃতার্থ হয়ে যাব। এখন সেই চেষ্টাই দেখ্‌তে হবে,—দেওয়ানী আর নয়!"

সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "আপনার জন্য সে-পারেও কাজ ঠিক হয়ে রয়েছে;—সেখানেও আপনি

"দেওয়ানজী।"

জ্ঞানানন্দবাবুর অন্তঃপুর-সংলগ্ন সুসজ্জিত উদ্যানে স্বভাব-সুন্দর বলিষ্ঠ এক তরুণ যুবক একটি পাঁচ বৎসরের সুন্দর নধর শিশুর হাত ধরিয়া বেড়াইতেছিল। উদ্যান পরিভ্রমণ করিতে করিতে একটি কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর নিকটে আসিয়া সেই

তরুণ যুবক তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া তাহার উপর কি যেন পড়িতে পড়িতে আপন মনেই হাসিতে লাগিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে তাহারই শ্রীহস্তের লেখা যাহা কালের বশেই অস্পষ্ট হইয়া মুছিয়া যাইতেছিল, কতকগুলি ফুল তুলিয়া লইয়া তাহার উপর ছড়াইয়া স্পষ্ট করিয়া ফুলের লেখা করিয়া দিল—"আজ যে দিদি হ'য়ে রাগ কচ্ছে—সেই একদিন বৌদিদি হয়ে সেধে সেধে কথা কইবেই।"

এমন সময় মায়াদেবী প্রাতরাশের জন্য নিজের শিশুপুত্র নিরঞ্জন ও দেবর সুধীরকে ডাকিতে আসিয়া দূর হইতে সুধীরের এই কীর্ত্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"ও বেদবাক্য ত লঙ্ঘন হয় নি ; ওর কোন কথাই ত ভুল হয় নি। এখন স্বাক্ষরটা হয়ে যাক্, ওটা আর বাকী থাকে কেন? ঠাকুরপো! আচ্ছা যাহোক তুমি! এখনও ও-কথা ভোল নি? এখন ওসব ছেলেমানুষী ছেড়ে দিয়ে খোকাকে নিয়ে খাবে এস ভাই!"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—"আমি আড়ি দেওয়া লোকের সঙ্গে কথা কব না, খাব না!" তারপর খোকাকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে খোকামণি, তোর মাকে বল্, আমাদের এখনও গুরুপ্রণাম হয়নি।"

তখন সেই হরিণশিশুর মত চঞ্চল, সদা প্রফুল্ল, দেবোপম কান্তিতে উদ্ভাসিত বালক আপন মনে খেলিতে খেলিতে নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে কতকগুলি ফুল ছিঁড়িতেছে, আর সেই উপহার রত্ন-সমূহ লইয়া সুধীরের হাতে এক একটি দিতে দিতে বলিতেছে—"কাকা, এ ফুল তোমার, এ ফুল বাবার, এ ফুল মা-মণির, আর এই বড় ফুলটি আমার দাদুমণির।"

এমন সময় বৃদ্ধ দেওয়ানজী সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন—

আর তোর দাদুকে ভাই মায়ার ডোরে বাঁধিস্ নি। এবার আমায় ছুটি দে। পরপারের ভাবনা ভাব্‌তে দে—আর ধরে রাখিস্ নে ভাইটি আমার।"

"আমি যেতে দেব না। কাকা যাবে না। তুমি দাদু আমার, লক্ষ্মী আমার, আমায় ছেড়ে যাবে না। তুমি যাবে ত আমার পূজার ঠাকুর কে হবে দাদু! বস দাদু, পূজো করি দাদু।" তারপর সেই সুন্দর দেবশিশু,বৃদ্ধ দেওয়ানজীর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে অতি মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিল—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

দেওয়ানজী সুধীরের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সুধীর, খুড়ো ভাইপোয় মিলে-মিশে আমায় কি অমর ক'রে বেঁধে রেখে দেবে বাবা? ছেড়ে দাও আর কেন, আমার যে সময় ফুরিয়ে এসেছে—পারে যাবার বেলা যে বয়ে যায়।"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেওয়ানজী, বাঙ্গলা ছেড়ে—আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবেন? আপনার মত লোক যদি মুক্তির পথে যেতে—কর্ম্মের সাধনা কর্‌তে বাঙ্গলার বাহিরে যায়, তা হ'লে বাঙ্গলার আজ বড় দুর্ভাগ্য। এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙ্গলায় কি না আছে, কে না এর কোলে বসে পরমানন্দ পেয়েছে। মহর্ষি ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেকেই যে সারা ভারত প্রদক্ষিণ করে শেষে আমাদের এই মাতৃস্বরূপা বঙ্গভূমির কোলে বসেই—সৎ-চিৎ-আনন্দ হয়ে গেছেন। এই বঙ্গেই তাঁরা শেষ

সমাধি নিয়ে আমাদের মায়ের কোল উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে গেছেন্ন। এমন সিদ্ধপীঠে পূর্ণ বাঙ্গলার মত সাধনার স্থান ছেড়ে আপনার অন্যত্র যাওয়া হতেই পারে না।"

দেওয়ানজী বলিলেন—"আমি যেন তেমনি করে এখানেই আমার মাকে দেখ্‌তে পাই। হে ভগবান্‌, আমার শেষ সমাধি যেন এই সোণার বাঙ্গলাতেই হয়।"

প্রভাত সমীরণের সুখস্পর্শ প্রবাহকে আরও সুখকর করিয়া তুলিবার জন্য কে একজন সেই সময় মায়া ও মহামায়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত "সনাতন আশ্রম" হইতে অতি সুমধুর স্বরে গায়িতেছিল—

"ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
* * * *
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
—ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি',
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।"

সেই সময় ভাবমুগ্ধ অতিবৃদ্ধ দেওয়ানজী সাশ্রু-নয়নে গললগ্নী-কৃতবাস হইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ,

ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হারমানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক-পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয় :—

মফস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক, ভিঃ পিঃ ডাকে ।৵০ মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিত-গুলি একত্র বা পত্র লিখিয়া সুবিধানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ও লইতে পারেন।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, **"গ্রাহক-নম্বর"** সহ পত্র দিতে হইবে।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **অভাগী** (৫ম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
৩। **পল্লীসমাজ** (৫ম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সং)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ।
৫। **বিবাহবিপ্লব** (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।
৬। **চিত্রালী** (২য় সংস্করণ)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। **দূর্ব্বাদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই।

৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।

৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম, এ।

৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। ভবানী—নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল।

৪৮। ছবি—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৯। মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু।

৫০। সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ।

৫১। মাচ্ওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ।

৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ।

৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর—শ্রীজলধর সেন (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।